৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৮

টপিক:

পররাষ্ট্রনীতি: লক্ষ্য নির্ধারণের উপাদান, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাদান, প্রণয়ন প্রক্রিয়া, জাতীয় শক্তির উপাদান, জাতীয় শক্তি ও বাংলাদেশ, নিরাপত্তা কৌশল, ভূ-রাজনীতি ও পরিবেশগত কৌশল, অর্থনৈতিক কূটনীতি ও শ্রমকূটনীতি, আন্তর্জাতিক সংস্থায় অংশগ্রহণ (UNO & UN Peace Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc) এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

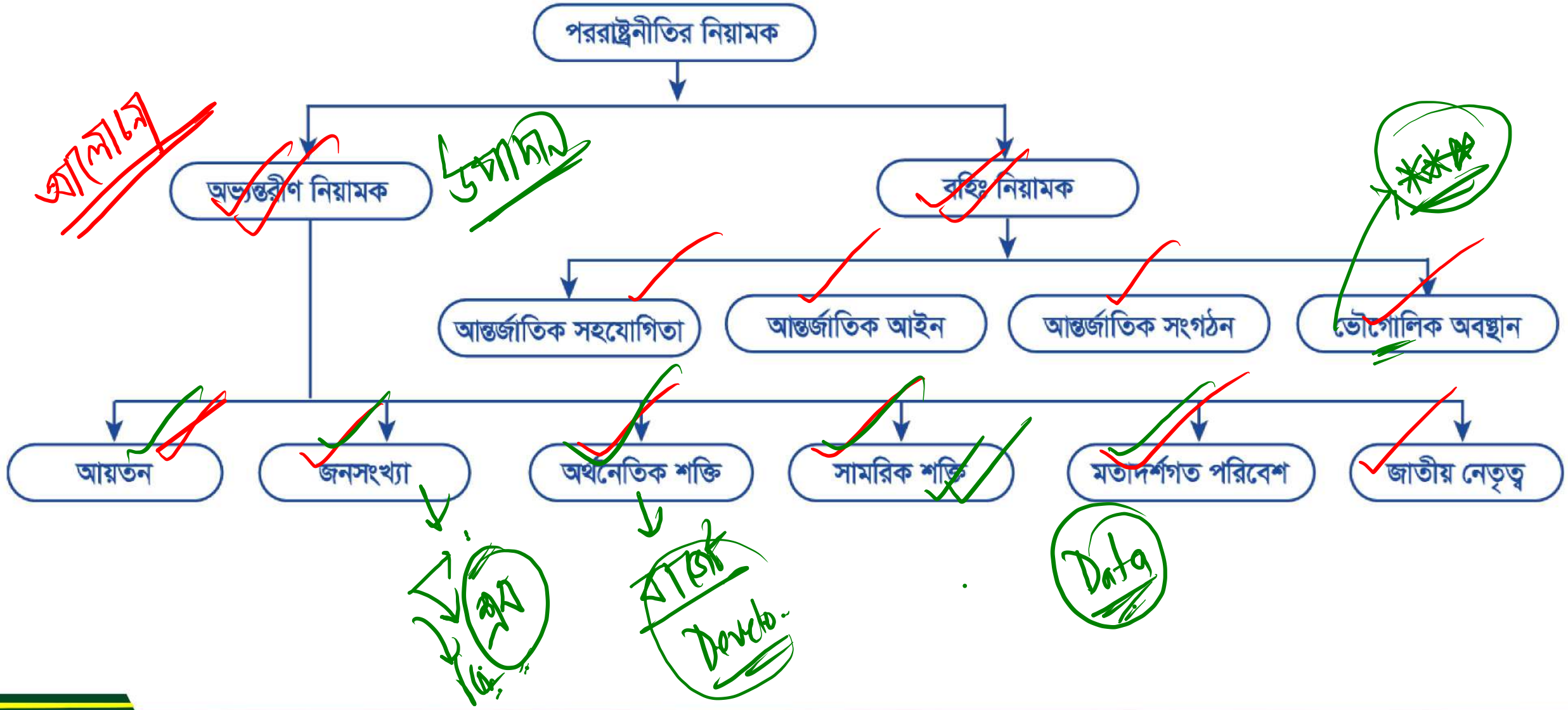

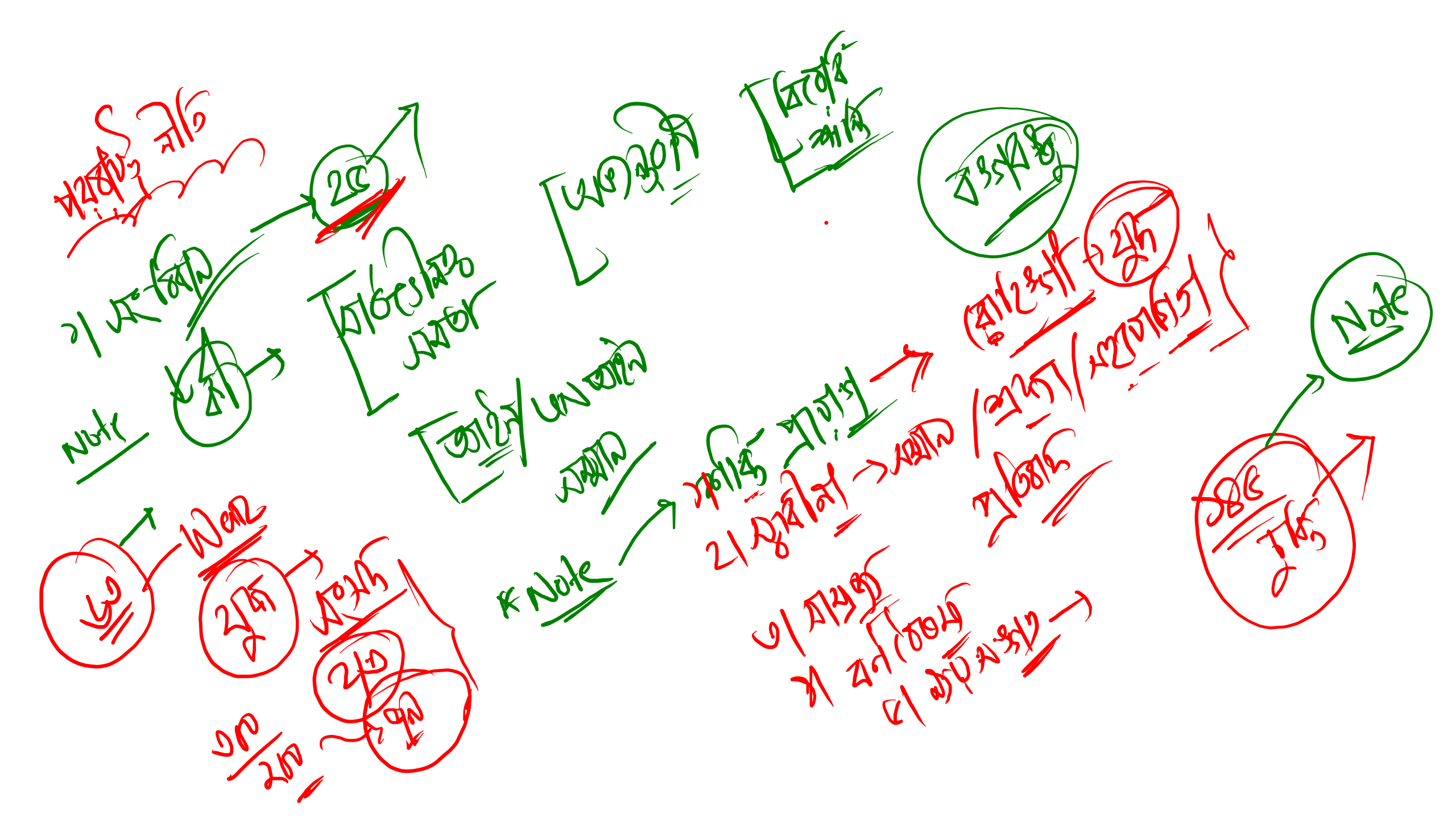

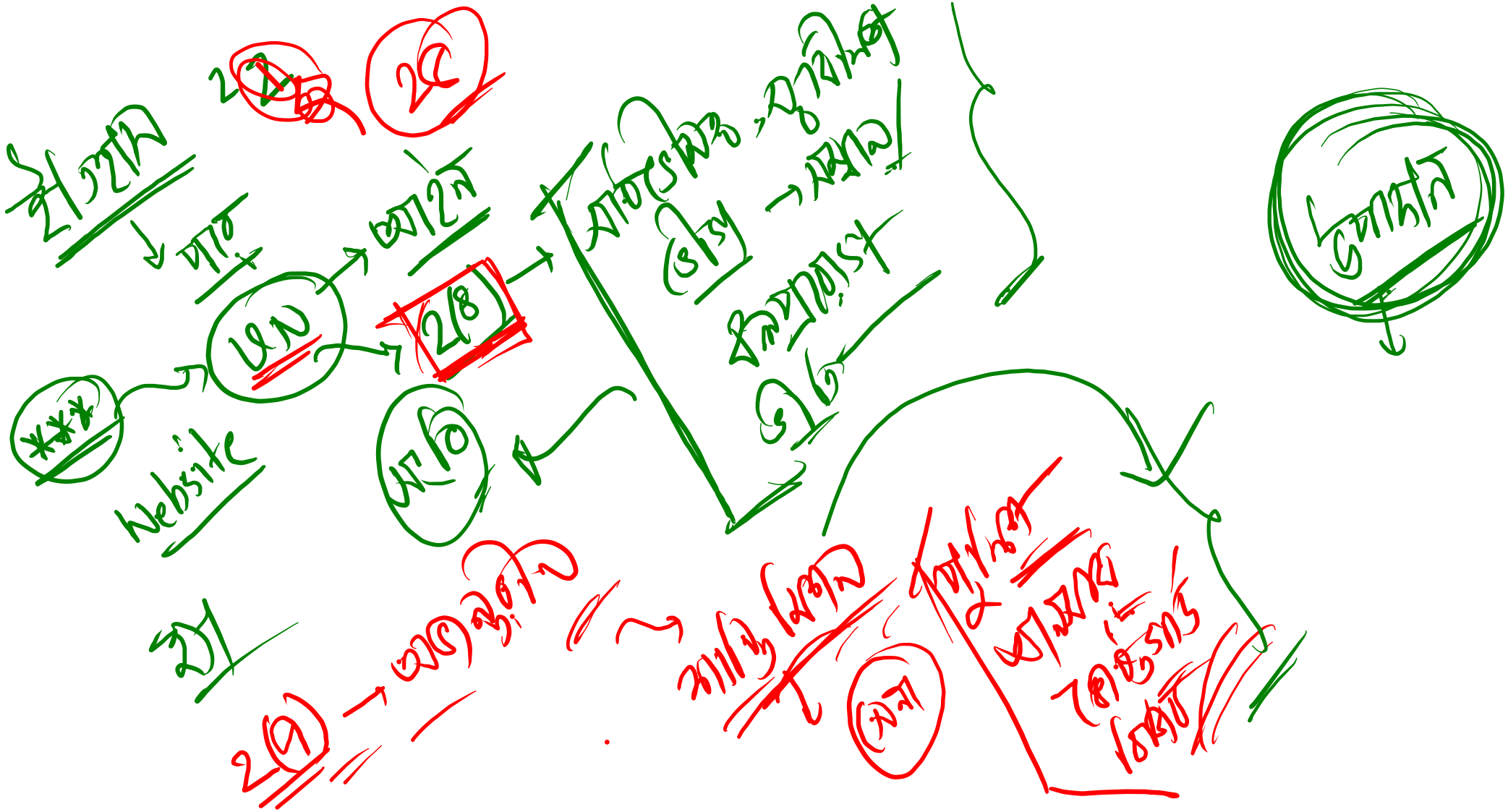

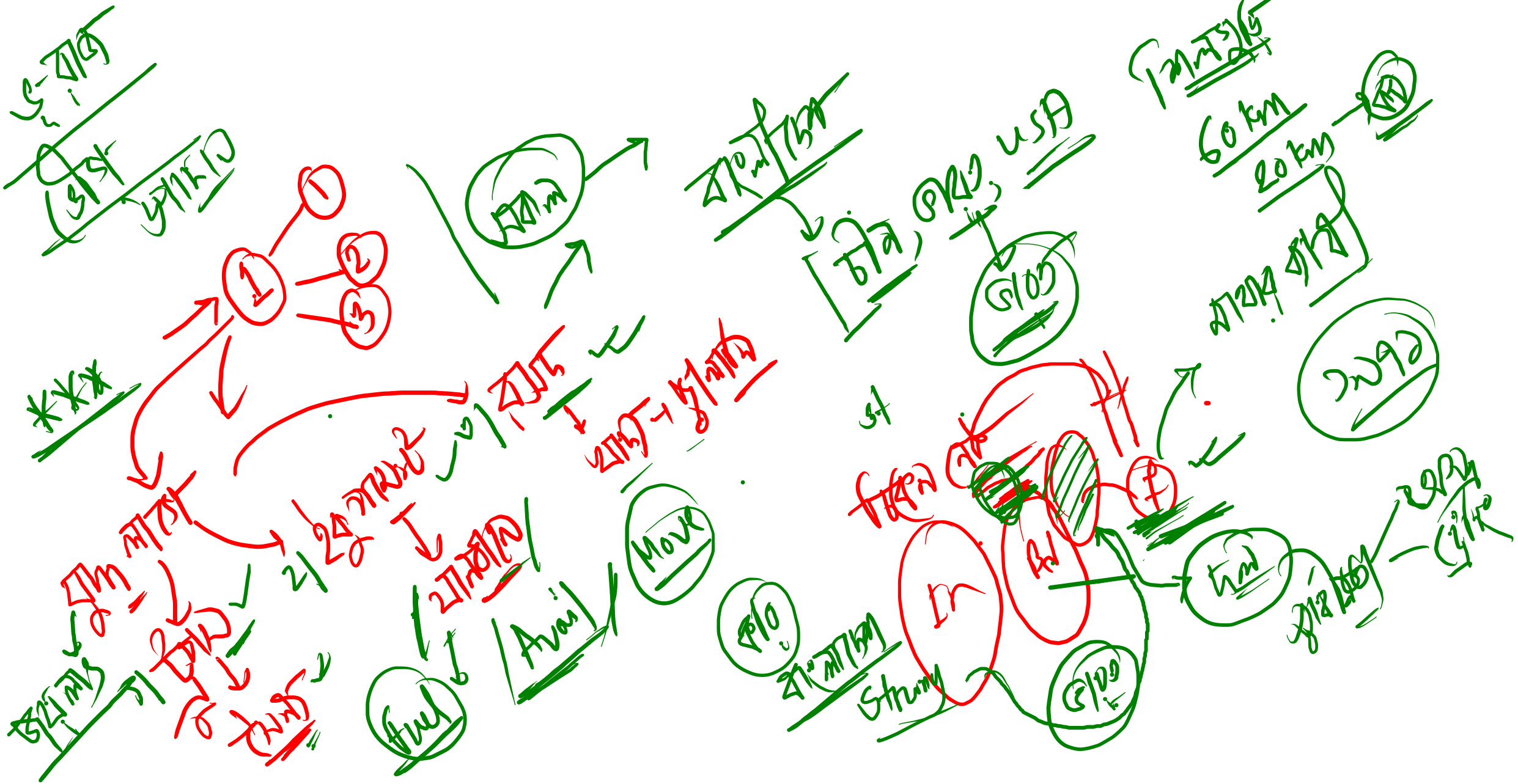

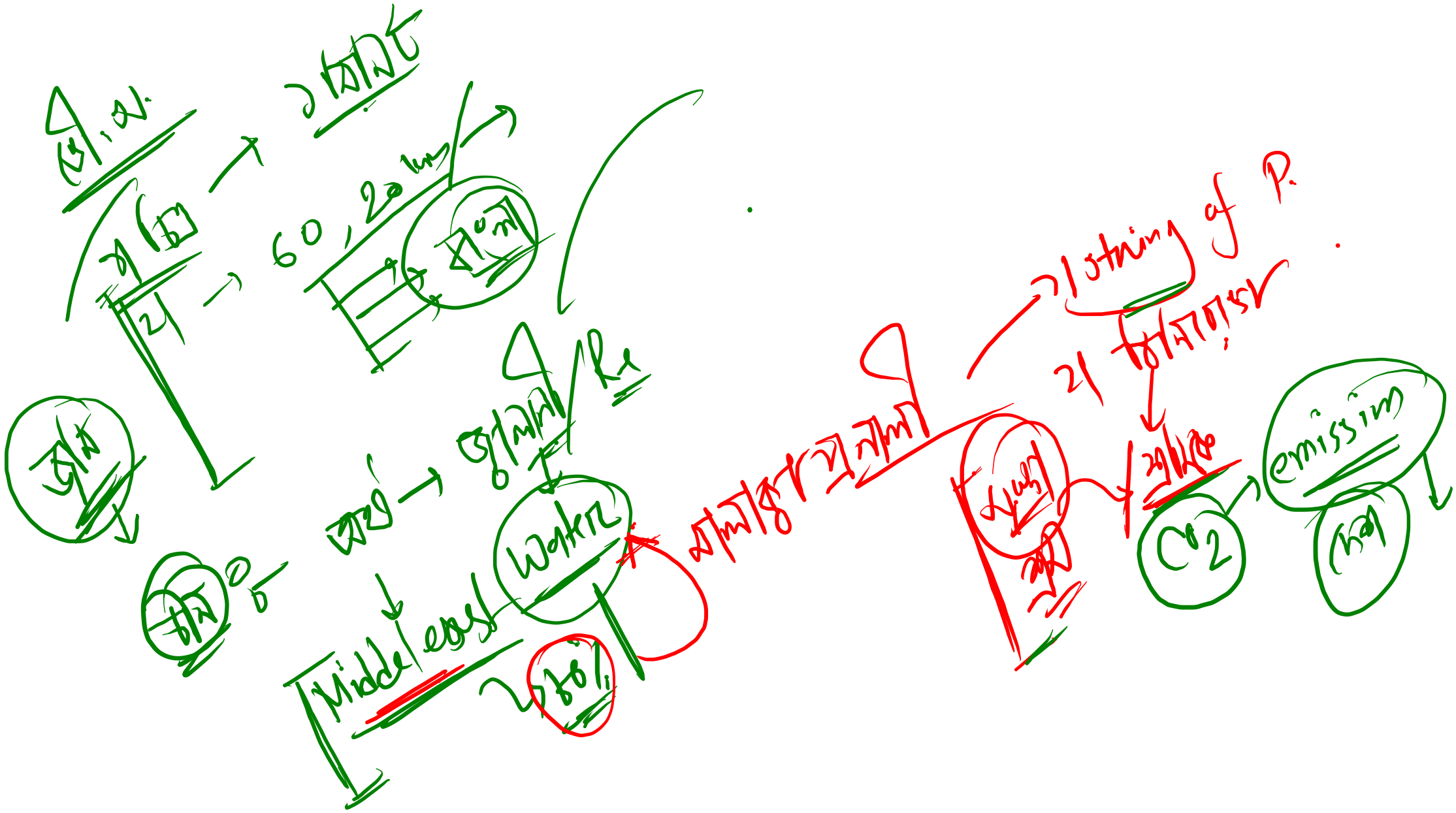

① + ②

1

2

3

4

***

2min

পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

আত্মরক্ষা

রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা বলতে সাধারণত বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা। জাতীয় নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টি এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বস্তুতপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার সম্মিলিত প্রতিফলন মাত্র। আমরা যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারটি কেন আমাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝতে সক্ষম হব। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পরও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি বহুবার বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি এসেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা বাস্তবিকই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ-কথা অতি সত্যি যে, আত্মরক্ষার প্রশ্নটি বাংলাদেশের জন্য অপর যে-কোনো ব্যাপারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

যদি আমরা আমাদের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হই, তবে তার পরেই আসবে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নটি। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানি অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। এ-বিষয়টি আমাদের নীতিনির্ধারকদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনই মূল্য থাকবে না, যদি না তা আমাদের দেশের কয়েক কোটি দরিদ্র নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনে। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি গরিব রাষ্ট্র, কিন্তু তবুও এর মধ্যে যে-সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা যদি আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তবে তা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সক্ষম হবে। বর্তমানে আমাদের যা দরকার, তা হলো সহজ শর্তে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং তা যথার্থ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়ে আমাদের উৎপাদন বাড়ানো এবং এভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা। একই সাথে এ-দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে উপযুক্ত বাজার পায়।

পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমাদের জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জাতীয় শক্তি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে আমাদের দেশের সার্বিক সক্ষমতা, যা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। জাতীয় শক্তি হলো অনেকগুলো উপাদানের যোগফল। ঐগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেন সে উল্লিখিত সম্পদরাজির উপর তার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে এবং সেই সাথে তার সমুদ্রের তলদেশ ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে অবস্থিত সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদের উপর যে-কোনো রকম বৈদেশিক দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। আমাদের নিজস্ব জাতীয় সম্পদের দাবিদার কোনো দেশের কোনো প্রকার চাপের মুখে আমরা কখনও নতি স্বীকার করব না। সেই সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, আমাদের কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে যেন অন্য কোনো রাষ্ট্র কোনো প্রকার প্রভাব খাটাতে না পারে। এভাবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হবে আমাদের জাতীয় শক্তির উপাদানগুলোকে সংরক্ষণ এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এগুলোকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো।

পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা

বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রই কোনো-না-কোনো মতবাদ অনুসরণ করে থাকে অথবা কমপক্ষে প্রচলিত যেকোনো দল-ভারী মতবাদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ব্যাপারে বলা যায় যে, সে ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক এ-দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের কোনটিই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে না–বরং সে অধিকাংশ আফ্রো-এশীয় দেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জোটনিরপেক্ষ নীতি মেনে চলে। বাংলাদেশ সবসময়ই চায় যাতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যকার একতা বজায় থাকে এবং এ-আন্দোলন উত্তরোত্তর জোরালো হয়।

জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি

মানুষ যেমন শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না, তেমনি কোনো দেশই তার আত্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়েই সুখী হতে পারে না। সে চায় বৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবারে মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকতে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর তাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, প্রধানত এ-কারণে যে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। এ অবস্থায় তাকে সাময়িকভাবে পরনির্ভরশীল হতে হয়েছে এবং এজন্য আমাদেরকে তলাবিহীন ঝুড়ি ইত্যাদি অবমাননাকর মন্তব্য সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এটা চিরদিনের জন্য চলতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশ যাতে তার মর্যাদা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে একটি সুন্দর ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে-ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উৎস

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বৈদেশিক নীতির ভিত্তি বা মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-

- ✓ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;
- ✓ প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং
- ✓ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উৎস

বন্ধুত্বের নীতি

'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়' বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ঘোষিত নীতি বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব জাতীয় প্রগতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশ এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তুলবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশ কোনো রাষ্ট্রকে শত্রু হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী নয়।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি। সিয়েটো, সেন্টো, ন্যাটো, ওয়ারশ প্রভৃতি সামরিক জোটের সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯৭২ সালের মে মাসে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "আমি কোনো ব্লকে নেই, প্রাচ্য ব্লকেও নয়, পাশ্চাত্য ব্লকেও নয়- আমি নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী"। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের একই সম্পর্ক রয়েছে। তবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে সব সময়ই স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উৎস

সম-মর্যাদার নীতি

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রের সম-সার্বভৌমত্ব এবং সম-মর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী। ফলে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানুক এটা বাংলাদেশ চায় না এবং সাথে সাথে নিজের সার্বভৌমত্বে আঘাত আসুক এটাও বাংলাদেশ কামনা করে না। বাংলাদেশ তাই সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার নীতি মেনে চলে।

উন্নয়নের নীতি

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি সব সময়ই উন্নয়নমুখী। তাই এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাতেও বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে বৈদেশিক সাহায্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভের জন্য বাংলাদেশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উৎস

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি

বাংলাদেশ শুধু নিজ দেশের সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার উপরও সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশ সব সময়ই বিশ্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে আগ্রহী।

বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিহার এবং যেকোনো বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ

ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের সাথে সংকীর্ণ সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশের তিন দিক ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত বলে এবং প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলো ভারতের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত হবার কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে উঠে।

বাংলাদেশের উপকূল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণে কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের অনুকূল পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছে, যার ফলশ্রুতিই হলো 'বিমসটেক'। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-ভাগ সন্নিহিত বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত বলে বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরকে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত রাখতে সচেষ্ট। কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের নিরাপত্তা যেহেতু ভারত মহাসাগরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সাথে যুক্ত, সে কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সে লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ

জনসংখ্যা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা চীন ও ভারতের মতো অধিকও নয়, আবার ভুটান ও মালদ্বীপের মতো কমও নয়। বাংলাদেশ জনসংখ্যাগত বিবেচনায় বিশ্বের মধ্যম পর্যায়ের একটি দেশ। এ দেশের ষোল কোটি জনসংখ্যা প্রধানতই সমজাতীয়। এ সমজাতীয় জনসংখ্যা বাংলাদেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্বে গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের মতো বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভীতি ও অস্তিত্ব সংকট তীব্র হয়ে উঠেনি। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কারো প্রতি নতজানু নয়, নিরাপত্তা জনশক্তি হিসেবে ব্যবস্থাও কারো উপর নির্ভরশীল নয়। এছাড়া, বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ জনশক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশও শ্রমশক্তির বাজারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের দর কষাকষি অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জনসংখ্যার গুরুত্ব তাই এতো বেশি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ

অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। একদিকে এদেশের শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, অন্যদিকে কৃষিতে সনাতন পদ্ধতির উপর নির্ভরতা বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন সংকট বিদ্যমান। এমনকি ভূ-অভ্যন্তরে যে সব প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ আছে তা উত্তোলনের ক্ষমতাও বর্তমানে বাংলাদেশের নেই। মূলত পুঁজি গঠনের নিম্নহার ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবজনিত কারণেই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে গতিশীল করা যাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশকে পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য উন্নত দেশসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিকে এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে উন্নত বিশ্বের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঋণ, সাহায্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্তর যদি উন্নত হতো তাহলে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক সাহায্য আদায়ে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতো না।

মতাদর্শগত পরিবেশ

মতাদর্শগত পরিবেশ অনেক সময়েই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। '৭৫-পূর্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের প্রভাবে বাংলাদেশ ছিল ভারত ও সোভিয়েত ঘেঁষা। পরবর্তীকালে উদার ও ইসলামি মতাদর্শ অনুসরণের ফলে দেশের সম্পর্ক বেড়েছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে। সাম্প্রতিককালে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের চরম বিপর্যয় এবং উদার গণতান্ত্রিক মতাদর্শের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পাশ্চাত্যমুখী ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ

সামরিক সামর্থ্য

বাংলাদেশের চেয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সামরিক ক্ষমতা বহু গুণ বেশি। সেজন্যে বাংলাদেশের মধ্যে সব সময়েই নিরাপত্তা ভীতি বিরাজমান। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলার এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু জল, স্থল ও আকাশে নিজের আত্মরক্ষার জন্যই উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ

বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে বিশেষভাবে ভারতের এবং সাধারণভাবে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশ ও মিয়ানমারের আচরণের উপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি নির্ভর করে। সীমান্ত সংশ্লিষ্ট বৈরিতা, জনসংখ্যা স্থানান্তর, সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ, বাণিজ্য ব্যবধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিবেশীদের আচরণের উপর দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। প্রতিবেশীদের আচরণ সংযত ও বন্ধুত্বপূর্ণ হলে বাংলাদেশও সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়ে উঠে। তা না হলে জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিবেশ, বিশেষ করে পারমাণবিক উত্তেজনা বাংলাদেশকে বিচলিত করে। তাই বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে পারমাণবিক প্রতিযোগিতামুক্ত বিশ্ব পরিবেশ গড়ে তোলার ইচ্ছা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

উপর্যুক্ত যেসব উপাদান নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেগুলোই পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য উপাদান। মূলত এসব উপাদানের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের মূলনীতি হলেও স্বাধীনতার পর থেকে সকল রাষ্ট্রের সাথে সকল সময়ে বাংলাদেশের সম্পর্কের মাত্রা ও প্রকৃতি এক রকম ছিল না। বিশ্ব রাজনীতির ও ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক নীতি পুনর্বিন্যাস করে থাকে। এক্ষেত্রে একটি দেশের জাতীয় স্বার্থই প্রধান চালিকা শক্তি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসের এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধুর বিশাল ভাবমূর্তিতে তিন বছরের মধ্যেই বিশ্বের প্রায় সকল দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ফোরামেও অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশ। সে সময় ভারত, অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও অধিকাংশ মুসলিম দেশ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এতদ্সত্ত্বেও বাংলাদেশ কোনো ব্লকের পক্ষে কিংবা কোনো ব্লকের বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি বরং বাংলাদেশ তার নিজস্ব অবস্থানে থেকে নিরপেক্ষভাবে সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিল। ১৯৭২ সালের মে মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা "আমি কোনো ব্লকে নেই, প্রাচ্য ব্লকেও নয়, পাশ্চাত্য ব্লকেও নয়,- আমি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী" এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান প্রকৃতিই ছিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন।

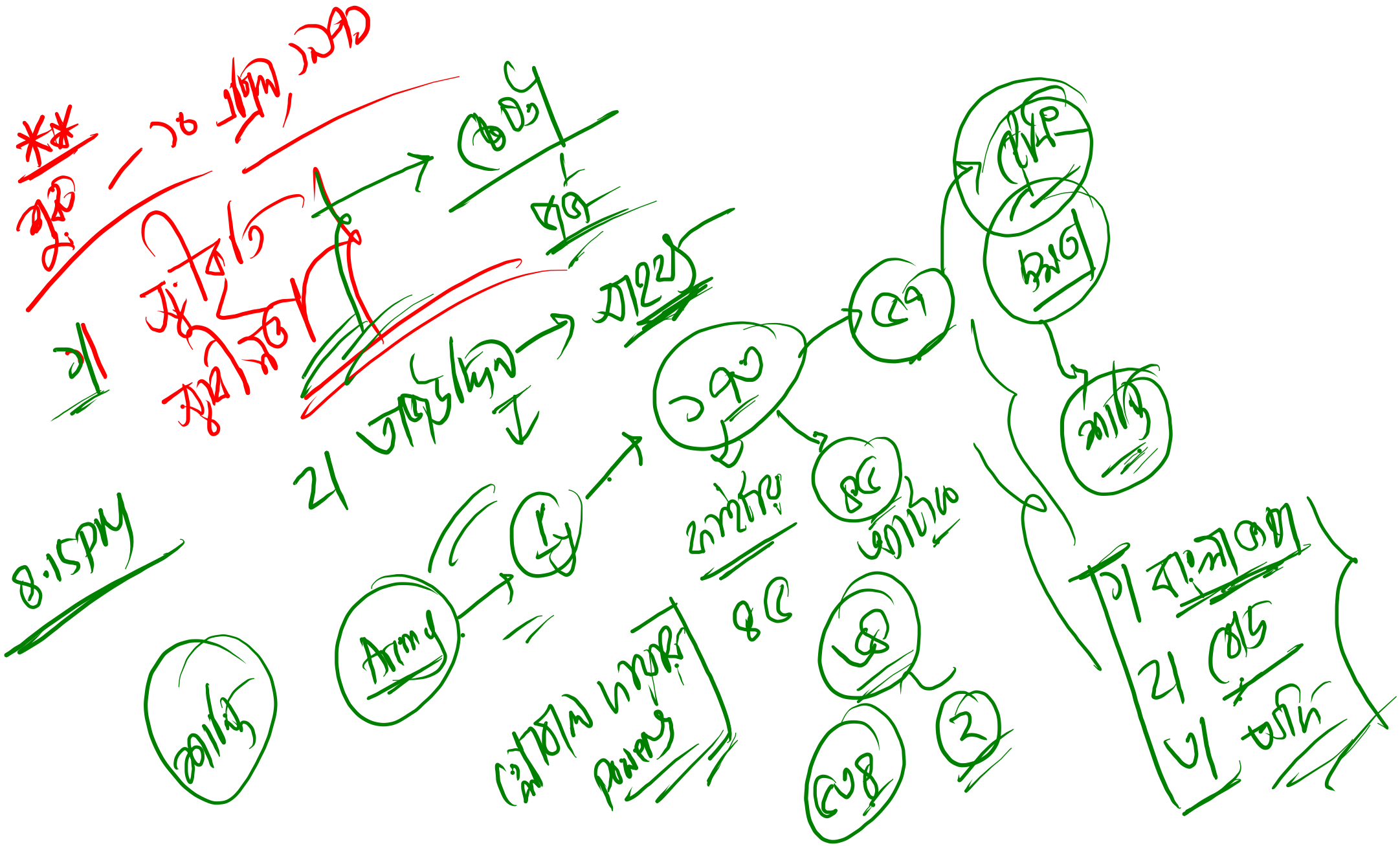

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সামরিক শাসকদের শাসনামল

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট ধাক্কা হিসাবে আবির্ভূত হয়। এসময় সেনাপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে পাকিস্তান-চীন-সৌদি আরব-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রমুখী করে তোলেন। এ ধারা সেনাশাসক জেনারেল এরশাদের আমলেও অব্যাহত থাকে।

গণতন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি দেশের সম্পর্ক যত বেশি বিস্তৃত হবে সেদেশের পররাষ্ট্রনীতি ততই শক্তিশালী হবে। সেজন্যই বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পর্কের দিগন্ত সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে রয়েছে সুসম্পর্ক। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ফোরাম সার্কের সক্রিয় সদস্য বাংলাদেশ। আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংগঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রশংসনীয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রাপ্তিও বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে সর্বোচ্চ স্বার্থ উদ্ধার করতে পারলে বাংলাদেশ দ্রুত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ব্যাপক সুবিধা অর্জন করতে পারবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের করণীয়:

সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানের সর্বাধিক সুবিধা আদায়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সরকারের সকল বিভাগগুলোর সমন্বয়ে একটি বিস্তৃত নীতিমালা প্রণয়ন করা। একটি দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা না থাকলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলোর মধ্যে এই ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকবে না, উদ্যোগগুলো সফল হবে না। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র হতে চাইলে যেমন সুপরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন তেমন বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষেরও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন যেন দ্রুত বন্দরগুলোতে পণ্য খালাস করা যায়। আবার বাংলাদেশের কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষ ও আমদানি-রপ্তানি তদারককারী সংস্থার মধ্যেও একটি সমন্বয় থাকতে হবে যাতে বাইরের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নত করে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে এভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের মধ্যে পারস্পারিক মত বিনিময় ও যোগাযোগের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

দর কষাকষির সুযোগ গ্রহণ

বাংলাদেশ বর্তমানে এমন একটি অবস্থায় আছে, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব বিস্তারে অনেকগুলো পক্ষ বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে চাচ্ছে। ভারত যেমন বাংলাদেশের দুই প্রান্তে থাকা তার অঞ্চলগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার করতে চায়, তেমনি চীন চায় তাদের বৃহৎ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরগুলো ব্যবহার করতে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে বঙ্গোপসাগরে তাদের প্রভাব ও সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে চায়। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সুযোগ রয়েছে প্রতিটি পক্ষের সাথে নিজ স্বার্থ আদায়ে দর কষাকষি করা। আর সেজন্য বাংলাদেশকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কূটনীতিকদের নিয়োগ করতে হবে এবং বিবেচনায় রাখতে হবে কাউকে যেমন অসন্তুষ্ট করা যাবে না, তেমনি আবার নিজেদের স্বার্থও জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে না।

উন্নয়নের জন্য সহায়তা আদায়

ভূ-কৌশলগত সুবিধা কাজে লাগাতে হলে বাংলাদেশের স্বার্থে ভূ-অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বড় ভূমিকা রাখতে পারে, এটা মাথায় রেখে অগ্রসর হতে হবে। টেকসই উন্নয়নে বিশ্বের ধনী দেশসমূহ থেকে বেশি বেশি সাহায্য আদায়ে ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লবিং প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজে লাগাতে হবে এবং বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের দাবি দাওয়াগুলো নিয়ে সোচ্চার হতে হবে।

নতুন মেরুকরণের জন্য কৌশল নির্ধারণ

বৈশ্বিক নানা পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে নতুন মেরুকরণ হতে যাচ্ছে। তাই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। যদিও অতীতে ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া আর সর্বশেষ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গড়া উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকস নিয়ে যে সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত বাস্তবে তা ঘটেনি। এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত উদ্যোগে যুক্ততার জন্য নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

জাতিসংঘে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ মূলত যুক্ত হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ; এবং শরণার্থীদের সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে গণহত্যা সংঘঠিত হয়, তা সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য বিশ্বনেতার সঙ্গে সেদিন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট এই গণহত্যাকে নিন্দা করে একে 'মানব ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সরকার গঠনের পর এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত ও রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করা। এ উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদলকে ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ প্লাজায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে আপোষ সম্ভাবনার পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের দীর্ঘ বক্তব্য পাঠানো হয় এবং এটি নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটিতে জাতিসংঘ সক্রিয় ছিল সেটা হচ্ছে শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ব্যবস্থাপনা ও অর্থ বলের প্রয়োজন ছিল, তা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে মেটানো সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালায়। শরণার্থীদের সহায়তার কাজে জাতিসংঘের এ সম্পৃক্তির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম কৌশলগতভাবেও লাভবান হয়। পাকিস্তান এবং আরো কিছু দেশ এ সংগ্রামকে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব বলে চিত্রিত করার যে অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, জাতিসংঘের এই সাহায্যের ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনার সদরুদ্দিন আগা খান সহ উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে UNHCR ছাড়াও WHO, FAO, UNICEF প্রভৃতি জাতিসংঘ-সংস্থা শরণার্থীদের জন্য কাজ শুরু করে।

অন্যদিকে, তৎকালে অধিকৃত-বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে জন আর কেলির নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ অপারেশন (ইউএনইপিআরও) ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। পরে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এই দায়িত্ব নেন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পদমর্যাদার পল ম্যাক্কি হেনরি। এ সময়ে মুজিবনগর সরকার অভিযোগ করে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা এ ত্রাণ কার্যক্রমের অপব্যবহার করছে। ১৬ নভেম্বর এ কার্যক্রমকে পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে জাতিসংঘ নিজেই এর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের উপর একটি নৈতিক আঘাত।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

যুদ্ধ পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনে জাতিসংঘের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশনস ঢাকা (আনরড) নামে পরিচিত জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এবং একজন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে এর দায়িত্বভার দেয়া হয়। স্যার রবার্ট জ্যাকসনের পরিচালনায় শুরু হয় এই জাতিসংঘ ত্রাণকার্য। এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তির মুখে আনরডের নাম কিছুদিনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হলো আনরব-এ, যার পুরো নাম বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম। ১৯৭৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী আনরব তার জরুরি ত্রাণ এবং পুনর্বাসন তৎপরতা শেষ করে তখন এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঐ সময় পর্যন্ত জাতিসংঘ পরিচালিত ত্রাণকার্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল আনরবের ত্রাণকার্য। বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্ক আরো জোরদার হয় যখন ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সফর দ্বারা জাতিসংঘ বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় সমর্থন দান করে। এ সময়ে জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধকালীন সময়ে বিধ্বস্ত চালনা পোর্টে ডুবে যাওয়া জাহাজসমূহও অপসারণ করা হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতেও জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ

বাংলাদেশের জাতিসংঘে যোগদান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও নীতিমালার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের যে সংবিধান গৃহীত হয় তাতে এমন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও বাক্য রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের সনদ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে: 'আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি' (অনুচ্ছেদ২৫)। বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টি সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার আলোকে প্রণীত হয়েছে, যা আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৎপরতা চালায়। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে পর পর দু'বার বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে। যোগদানের এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ করলেও এর পূর্ব থেকেই জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে প্রথম জাতিসংঘ সংস্থায় সদস্যরূপে স্বাগত জানায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এর পর পরই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশিরভাগ বিশেষায়িত অঙ্গ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় বাংলাদেশের নেতৃত্বদান

- **সাধারণ পরিষদ:** জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের এক বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ:** ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দু'বার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) এর সদস্য হিসেবে কাজ করে।
- **জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ:** অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দু'বার নির্বাচিত হয়, প্রথমবার জাপানকে পরাজিত করে ১৯৭৯-৮০ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০০০-২০০১ সালে। বাংলাদেশের প্রথমবারের (১৯৭৯-৮০) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে সময়ে বিশ্বে ঠান্ডাযুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং বিভিন্ন সংকটকালীন এজেন্ডা, যেমন: আরব-ইসরায়েল উত্তেজনা, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামীদের আগ্রাসন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত অনুপ্রবেশ, ইরানের হোস্টেজ ইস্যু, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফ্রিকান রাষ্ট্র রোডেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডা হিসেবে উত্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

দ্বিতীয় মেয়াদে সদস্যপদ লাভের সময়েও (২০০০-২০০১) বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। অ্যাঙ্গোলা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি), ইরাক, কসোভো, সিয়েরা লিয়ন এবং পূর্ব তিমুরের মতো বিষয়গুলো এ সময়ের নিরাপত্তা পরিষদের প্রাধান্য বিস্তারকারী ইস্যু হিসেবে বিবেচিত। এসময়ে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ দুটো কমিটি, সিয়েরা লিয়ন বিষয়ক কমিটি এবং অনুমোদনের ভূমিকা বিষয়ক কার্যকমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০০০ সালের মার্চ মাসে এবং ২০০১ সালের জুন মাসে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

- **নীতি নির্ধারণ ও নিরস্ত্রীকরণ:** ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে জাতিসংঘ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করে এবং ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে পাশকৃত পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ বিষয়ক চুক্তি (NPT) প্রণয়নে ভূমিকা রাখে।

- **মানবাধিকার ও উন্নয়ন:** ১৯৮২-৮৩ মেয়াদে ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ১৯৮০ থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ কাজ করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (UNHCR) এবং ১৯৯৮ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিটিডি কমিটির হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫ সালে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯৮৩-২০০০ মেয়াদে এবং ২০০৬-২০০৮ মেয়াদে কাজ করে।

- **জলবায়ু বিপর্যয়:** জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের ফোরাম CVF (Climate Vulnerable Forum) এর চেয়ার হিসেবে ২০১১-১৩ এবং ২০২০-২২ দুই মেয়াদে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

জাতিসংঘের বিভিন্ন সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রধান সম্মেলনগুলোতে বরাবরই অংশগ্রহণ করে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে জাতিসংঘের আহবানে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়েছে বাংলাদেশ সবকটিতেই অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন ঘোষণা, প্ল্যান অব অ্যাকশন প্রণয়নে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরদাতা ও অনুসমর্থনকারী দেশ। এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল যা বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন হয়েছে সেগুলো হলো–

- সকল প্রকার বর্ণগত বৈষম্য বিলোপে আন্তর্জাতিক কনভেনশন
- নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের বৈষম্য বিলোপে কনভেনশন (সিডো)
- শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট
- এন্টি পারসোন্যাল মাইন ব্যবহার প্রতিরোধ বিষয়ক চুক্তি
- মরুকরণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCCD)
- রিও জীববৈচিত্র্য কনভেনশন
- ভিয়েনা কনভেনশন
- মন্ট্রিল প্রটোকল- ইত্যাদি

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা, জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ দূর ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো শান্তি বিঘ্ন হয়েছে বা হবার উপক্রম হয়েছে এমন এলাকায় পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ এবং দ্বিতীয়ত, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ। অস্ত্রবিরতি নিশ্চিত করা, নিবৃত্তিমূলক সেনা মোতায়েন, সার্বিক বিরোধ নিষ্পত্তি ও মানবিক সাহায্যের সুরক্ষার জন্য শান্তিরক্ষী মিশন কাজ করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত থেকে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রথম শান্তি মিশন ছিল ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময়। এ মিশনটির নাম ছিল United Nations Iran Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)। বাংলাদেশ এ পর্যবেক্ষণ মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জনকে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় যৌথবাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। শান্তিরক্ষা মিশনে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ১৯৯৯ সালে সরকার "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং" (BIPOST) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। শান্তি সহায়তা কার্যক্রমে কীভাবে কাজ করতে হয় তার প্রশিক্ষণ দান করাই এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বি.ডি.আর, আনসার এবং কোস্টগার্ড সদস্যরা শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা শান্তিরক্ষায় বিদেশে যেমন সুনাম অর্জন করছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রাও দেশে নিয়ে আসছে। এ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও রিজার্ভ ঘাটতি পূরণে সহায়তা করছে। এ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কেননা মোট রেমিটেন্সের কিছু অংশ শান্তিরক্ষীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে আসে।

শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর সদস্যগণ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করে নিজেরা যেমন লাভবান হয়েছে, তেমনি দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করেছে এবং সবশেষে বিশ্ববাসীর সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করেছে। এর ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষ করে ২০০৫ সালে আফ্রিকার কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে প্রেরিত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১০ জন সদস্য সেখানকার দুষ্কৃতকারী মিলিশিয়াদের হাতে নিহত হলে বিশ্ববাসী বাংলাদেশি জনগণ ও সরকারকে সমবেদনা জানায়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ সুদানে সংঘটিত সন্ত্রাস ও গৃহযুদ্ধের সময় জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল বান কী মুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের আচরণ ও কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে ২০০২ সালে সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রপতি বাংলা ভাষাকে সে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রশংসা করেছেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় শান্তিবাহিনীতে বাংলাদেশি সদস্যদের সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Alignment Movement – NAM)

অধ্যাপক বার্টনের মতে, জোট নিরপেক্ষতা হলো এমন এক নীতি যার মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক কোনো জোটেই যোগদান করে না। অর্থাৎ তৎকালীন সোভিয়েত বা মার্কিন কোনো জোটে যোগদান না করে উভয় জোটের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে জোট নিরপেক্ষতা। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ✓ কোনো সামরিক জোটভুক্ত দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হতে পারে না।
- ✓ সামরিক জোটভুক্ত নয় এমন যেকোনো দেশ স্বেচ্ছায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হতে পারে এবং যেকোনো সময় জোট ত্যাগ করতে পারে।
- ✓ জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকে সমর্থন দিতে পারে না।
- ✓ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম দিক।
- ✓ জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক মর্যাদায় বিশ্বাসী।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আলজিয়ার্স সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। এরপর থেকে প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করেছে এবং জোরালো ভূমিকা রেখেছে। এ কারণেই বাংলাদেশ অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর ফোরাম 'জি-৭৭' - এর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে বলেই বহু রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির উপর বাংলাদেশের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের আদর্শের ভিত্তিতে তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছে। যার মধ্যে শান্তি, সমতা ও বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। জোট নিরপেক্ষতার চেতনার আলোকে বাংলাদেশ নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরোধিতা করেছিল। এছাড়া, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী ও কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনী প্রত্যাহারেরও জোর দাবি জানিয়েছিল। বর্তমানে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে। এ সব কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব সহযোগিতা অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি কার্যকর ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণেই, বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

Commonwealth

Commonwealth of Nations বা কমনওয়েলথ হলো অতীতে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি গঠিত হয়। কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। বর্তমানে এ সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৫৬। যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানি এ সংস্থার প্রতীকী প্রধান। এ সংস্থার সচিবালয় লন্ডনের মালবোরো হাউসে অবস্থিত। যুক্তরাজ্যই সংস্থাটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার 'কমনওয়েলথ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

বাংলাদেশ কমনওয়েলথের ৩২তম সদস্য রাষ্ট্র। ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়। এরপর থেকে কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ। বাংলাদেশের কমনওয়েলথে যোগদানের প্রতিবাদে পাকিস্তান এই সংস্থা থেকে পদত্যাগ করেছিল। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই কমনওয়েলথের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করেন।

কমনওয়েলথের মূলশক্তি যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষ করে বি.বি.সি. এবং লন্ডন টাইমস স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনগণের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করেছিল। কমনওয়েলথের আরেক শক্তিশালী সদস্য অস্ট্রেলিয়ার ভূমিকাও ছিল এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। যুক্তরাজ্যসহ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সচল করে তোলার জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো অকাতরে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল।

সার্ক (South Asian Association for Regional Co-operation – SAARC)

সার্কের জন্ম ও বিকাশধারা: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে সার্ক গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়।
৭ ও ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন ঐক্যবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC: South Asian Association for Regional Co-operation) আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। সম্মেলনে সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ যোগদান করেন এবং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে-এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন যা ঐতিহাসিক 'ঢাকা ঘোষণা' নামে পরিচিত। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় সার্কের ১ম শীর্ষ সম্মেলন হতে শুরু করে এ পর্যন্ত ১৮টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে পালাক্রমে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সার্কের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

- ✓ দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবন মান উন্নত করা।
- ✓ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক প্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।
- ✓ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যৌথ স্বনির্ভরতাকে উন্নত ও জোরদার করা।
- ✓ একে অন্যের সমস্যায় পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও সহযোগিতার হাত প্রসার করা ।
- ✓ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং
- ✓ আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিন্ন স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

সাপটা (SAPTA)

সাপটা (SAPTA)-এর পূর্ণ অর্থ হলো- দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার মূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা (South Asian Preferential Trade Agreement)। সার্কভুক্ত দেশগুলো ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭ম শীর্ষ সম্মেলনের সময় সাপটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সাপটাকে ২০০৬ সালে সাফটায় (South Asian Free Trade Agreement-SAFTA) রূপান্তরিত করা হয়। সাফটা কার্যকর হবার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে।

সার্কের সর্বশেষ অবস্থা

১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন, যা ২০১৬ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানে হওয়ার কথা ছিল নিরাপত্তার অযুহাতে সকল সদস্য রাষ্ট্র সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে। তখন থেকেই সার্কের কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা চলে আসে। এই আঞ্চলিক জোটের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অন্য একাধিক আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোট যেমন: BIMSTEC, BCIM, BBIN ইত্যাদিতে আগ্রহ দেখানোর ফলে এই স্থবিরতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন।

ও.আই.সি (Organisation of Islamic Cooperation- OIC)

১৯৬৯ সালে মসজিদুল আকসায় ইহুদিদের অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা বিক্ষোভ, ঘৃণা এবং নিন্দায় ফেটে পড়লে মুসলিম ঐক্যের বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে ঐ বছর ২৪টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি কার্যকর পদক্ষেপের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন সংগঠনের প্রয়োজনে এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় ও.আই.সি। ২০১১ সালের ২৮ জুন আস্তানা, কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাউন্সিলে প্রতিষ্ঠানটির নাম ইসলামি সম্মেলন সংস্থা পরিবর্তন করে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা করা হয়। OIC প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি বিশেষ সম্মেলনসহ মোট ১৩টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ও.আই.সি. এর কর্ম-প্রক্রিয়া, লক্ষ্য ও নীতিমালা

মূলত চারটি প্রধান কর্ম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার কাজ পরিচালিত হয়।

- ✓ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন;
- ✓ মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রিদের সম্মেলন;
- ✓ ইসলামি সেক্রেটারিয়েট এবং তার পার্শ্ব সংগঠন;
- ✓ আন্তর্জাতিক ইসলামি বিচারালয়।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

ও.আই.সি.-তে বাংলাদেশের অবস্থান

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বিভিন্ন পরিকল্পনাভিত্তিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। বাংলাদেশ মূল সংস্থার সদস্য ছাড়াও সংস্থার অন্য সব ক'টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য। বাংলাদেশ তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিটি, ১৪ সদস্যবিশিষ্ট আল-কুদস কমিটি, নয় সদস্যবিশিষ্ট ইরাক-ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতাকারী শান্তি কমিটি, তের সদস্যবিশিষ্ট তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, তের সদস্যবিশিষ্ট ইসলামি অর্থ তহবিলের স্থায়ী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালের ৬-১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ইসলামি সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের চতুর্দশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের অবস্থান জোরদার হয়ে উঠে। ফলে পরবর্তী সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশের বক্তব্য অধিক গুরুত্ব পায়।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

BIMSTEC

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation বা সংক্ষেপে BIMSTEC দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভুটান ও নেপাল– এই দেশগুলো নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক জোট। মূলত বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে অবস্থিত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য গঠিত ফোরাম/সংস্থাই হলো BIMSTEC। এর সদর দপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা BIMSTEC এর প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

গঠন: ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে "ব্যাংকক ডিক্লারেশন" অনুযায়ী Bay of Bengal Economic Cooperation Organization গঠিত হয়। পরে সদস্য দেশগুলোর নামানুসারে সংগঠনটির নাম রাখা হয় BISTEC; বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন। পরে এতে মিয়ানমার যোগ দিলে নাম দাঁড়ায় BIMSTEC। ভুটান ও নেপাল ২০০৪ সালে সংগঠনটিতে যোগ দিলে সংগঠনটির নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গুরুত্ব: দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশের উদ্যোগে 'দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা' বা SAARC যে প্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, বাস্তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নিজেদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা না হওয়ায় তিন দশক পুরোনো এই সংস্থাটি একটি অকার্যকর সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

এমন অবস্থায় BIMSTEC একটি কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নানাভাবে –

- BIMSTEC দক্ষিণ এশিয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এ জোটভুক্ত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা এক দশমিক ৩ বিলিয়ন, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ। একই সঙ্গে সম্মিলিত GDP এর পরিমাণ ২.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিকাশমান অর্থনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে এই অঞ্চলের গুরুত্ব এখন পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

- BIMSTEC-কে বলা হচ্ছে থাইল্যান্ডের 'লুক ওয়েস্ট পলিসি' এবং ভারতের 'লুক ইস্ট পলিসি' এর সম্মিলন। অবশ্য সংস্থাটি গঠনের উদ্যোগ থাইল্যান্ডেরই। এর আর একটি দিক হলো SAARC ও ASEAN এর সংযোগ। এখানে আছে SAARC এর ৫টি দেশ এবং ASEAN ভুক্ত দেশ থাইল্যান্ড। BIMSTEC অংশগ্রহণের বিষয়ে থাইল্যান্ডের আবেদনে ভারতের সাড়া দেয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে সহজে যোগাযোগ স্থাপন, অনুন্নত এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আসাম, অরুনাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিমে আন্ত:নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তাও এতে জড়িত।

- BIMSTEC এর গতিশীল নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনা, তিনি যেভাবে তাঁর নেতৃত্বগুণে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন তেমনি বাকি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসলে BIMSTEC আরো গতিশীলতা পেতে পারে। BIMSTEC এ জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করা গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার, জ্ঞান গবেষণা, বিজ্ঞান-সংস্কৃতি, সর্বমুখী এবং কার্যকর শিক্ষার মান উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

- একটি ট্রান্সন্যাশনাল হাইওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে BIMSTEC এর সদস্য বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও মিয়ানমার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু। আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারিত হবে। সম্ভব হবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর উল্লিখিত চারটি দেশ ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে।
- BIMSTEC অঞ্চলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ বসবাস করলেও সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে এরা অনেক পিছিয়ে। Food security নিশ্চিত করতে শস্য ভাণ্ডার হিসেবে BIMSTEC যাতে কার্যকর হয় সেজন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এই অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ। BIMSTEC এর সহযোগিতার ১৪টি ক্ষেত্রের মধ্যে কাউন্টার টেররিজম ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় যৌথ উদ্যোগও রয়েছে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, উন্নয়নের একটি বড় শর্তই হলো গণতান্ত্রিক পরিবেশ। আশার কথা, BIMSTEC দেশগুলো গণতান্ত্রিক ধারার পথেই রয়েছে। এটাও দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের অন্যতম বড় স্তম্ভ। ভারত যদি বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে এবং থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এগিয়ে আসে তবে একটি সত্যিকার আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে BIMSTEC আগামী দশবছরে শক্তিশালী অবস্থানে যেতে পারবে।

D-8

মুসলিম প্রধান উন্নয়নশীল আটটি দেশের আন্তঃউন্নয়ন সহযোগিতার জন্য গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হচ্ছে D-8। এই জোটের সদস্য দেশগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়া। মুসলিমপ্রধান উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার প্রাথমিক ধারণাটি তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর ড. নাজমউদ্দিন এরবাকান উত্থাপন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নে সহযোগিতা' শীর্ষক সেমিনারে এমন একটি সংস্থার ধারণা দেন। সভায় D-8 এর সীমানা নির্ধারণ করা হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত উন্নয়নশীল মুসলিমপ্রধান দেশগুলো নিয়ে। সেমিনারে বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সম্মেলনটি ছিল D-8 প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আনুষ্ঠানিকভাবে D-8 প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরুত্ব: D-8 এর সদস্য দেশগুলোর রয়েছে ১১০ কোটি জনসংখ্যা এবং চার ট্রিলিয়ন ডলারের GDP। ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য নিয়ে D-8 এরই মধ্যে একটি বড় অর্থনৈতিক ব্লকে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান PricewaterhouseCoopers এর মতে D-8 সদস্য দেশগুলো ২০৫০ সালে বিশ্বের শীর্ষ ২৪টি অর্থনীতির তালিকায় থাকবে এবং ৩৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্মিলিত GDP নিয়ে এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বর্তমান অবস্থা: সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তি, বিরোধিতার পরিবর্তে সংলাপ, শোষণের পরিবর্তে সহযোগিতা, দ্বিমুখিতার পরিবর্তে ন্যায়বিচার, বৈষম্যের পরিবর্তে সমতা ও নিপীড়নের বদলে গণতন্ত্রের মতো বিষয়কে স্লোগান হিসেবে নেওয়া হলেও এসব বিষয়ে D-8 এর তেমন কোনো দৃশ্যমান ভূমিকা চোখে পড়ছে না, অগ্রগতিও লক্ষ করা যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০২২ সালের ২৬-২৭ জুলাই ঢাকায় D-8 জোটের ২৫তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে D-8 কার্যকর না হবার পেছনে কিছু কারণ উঠে আসে। সেগুলো হলো:

- সম্মেলনে একজন কূটনীতিক বলেন, সৌদি আরব না থাকায় মুসলিম বিশ্বের এই আটটি দেশ একসঙ্গে বহু কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। তবে তাদের মধ্যে মতবিরোধ বেশি থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ হচ্ছে না। এমনকি জোটের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, সেখানেও সব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন না। ফলে এই সম্মেলনের ঘোষণা বাস্তবায়ন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

- সম্মেলন শেষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, D-8 সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এই জোটের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য দশ গুণ বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু জোটের সদস্যরা যে প্রিফারেনসিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করতে চাচ্ছে তাতে সাতটি সদস্যরাষ্ট্রসমূহ D-8 PTA অনুসমর্থন করলেও মিশর করেনি। তাই এটি কার্যকর করাও যাচ্ছে না।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

- জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের যে অভাব রয়েছে এবং নেতাদের আন্তরিকতার যে ঘাটতি রয়েছে, তার প্রমাণ হলো, অর্থনৈতিক সহযোগিতা গভীর করার জন্য একে অপরকে ট্যারিফ সুবিধা দেওয়া, নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো, রিজিওনাল গ্রুপিং করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো নিজেদের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার ব্যবস্থা তৈরি করা এসব কিছুই করা হয়নি D-8 সদস্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্য পরিবহণ ও মানুষজনের যাতায়াত সহজ করা হয়নি। দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানো, কোনো ধরনের উদ্যমী উদ্যোগ কোনো দেশ বা কোনো নেতার পক্ষ থেকে নিতে দেখা যায়নি।

- D-8-এর সদস্য দেশগুলো প্রত্যেকে আবার অন্য জোটের সদস্য। প্রত্যেকেই অন্যান্য আঞ্চলিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। যেমন : বাংলাদেশ রয়েছে বিমসটেকে। অন্যদিকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আসিয়ানের সদস্য। ইরান ও তুরস্কের মধ্যেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। আবার তুরস্ক চায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের রয়েছে বাণিজ্যিক চুক্তি। যে আঞ্চলিক চুক্তি বা জোট বেশি স্বার্থ সংরক্ষণ করে সেটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে D-8-এর মাধ্যমে এর সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ সেভাবে হয়নি, তাই এই জোটকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে খুব একটা উদ্যোগ দেখা যায়নি।

আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ

- ভৌগোলিকভাবেও সদস্য দেশগুলোর অবস্থান অনেক বিচ্ছিন্ন এবং তাদের একক কোনো স্বার্থ নেই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘর্ষ রয়েছে। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও রয়েছে। যেমন : বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের স্বার্থে বড় ধরনের দূরত্ব অনেক পুরোনো ব্যাপার। সর্বশেষ সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানির বাংলাদেশে না আসাটা তারও ইঙ্গিত কিছুটা হলেও বহন করছে। দেশগুলোর মধ্য অর্থনৈতিক অবস্থানেও অনেক পার্থক্য রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান উন্নত করা, বাণিজ্য সম্পর্কের বৈচিত্র্য আনয়ন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে D-8 জোটভুক্ত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সকল সমস্যা দূর করে একত্রে কাজ করলে বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশই উপকৃত হবে।

বাংলাদেশের বাণিজ্য

বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যে বাংলাদেশ সাধারণত ঘাটতিতে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো- তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁচা পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি। অন্যদিকে বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্য হচ্ছে মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, ভোজ্য তেল, পরিবহণ সামগ্রীসহ নানান ভারী শিল্পের যন্ত্রপাতিসমূহ। নিম্নে বাংলাদেশের বাণিজ্যে [এফওবি (ইপিজেডসহ)] ভারসাম্য তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশের বাণিজ্যে [এফওবি (ইপিজেডসহ)] ভারসাম্য (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	আমদানি	রপ্তানি	বাণিজ্য ভারসাম্য
২০১৭-১৮	৫৪.৪৬	৩৬.২৮	– ১৮.১৮
২০১৮-১৯	৫৫.৪৪	৩৯.৬০	– ১৫.৮৪
২০১৯-২০	৫০.৬৯	৩২.১২	– ১৮.৫৭
২০২০-২১	৬০.৬৮	৩৬.৯০	– ২৩.৭৮
২০২১-২২*	৫৪.৩৮	৩২.০৭	– ২২.৪৩

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক]

বাংলাদেশের বাণিজ্য

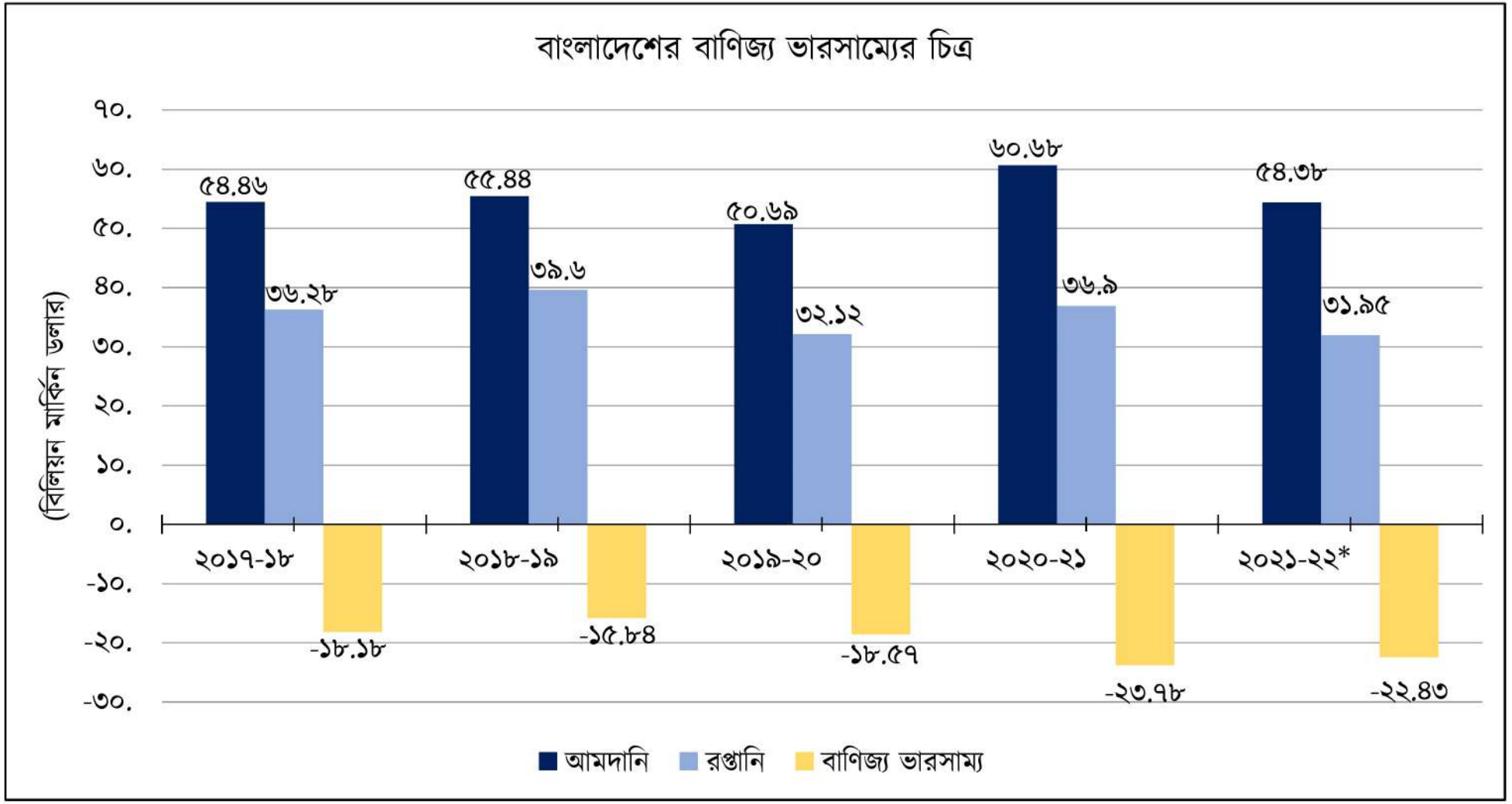
বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের চিত্র
(বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৭০.
৬০.
৫০.
৪০.
৩০.
২০.
১০.
০.
-১০.
-২০.
-৩০.
৫৪.৪৬
৩৬.২৮
-১৮.১৮
৫৫.৪৪
৩৯.৬
-১৫.৮৪
৫০.৬৯
৩২.১২
-১৮.৫৭
৬০.৬৮
৩৬.৯
-২৩.৭৮
৫৪.৩৮
৩১.৯৫
-২২.৪৩
২০১৭-১৮
২০১৮-১৯
২০১৯-২০
২০২০-২১
২০২১-২২*
আমদানি
রপ্তানি
বাণিজ্য ভারসাম্য

বাংলাদেশের বাণিজ্য

আমদানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুসারে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬৫.৫৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি খাতে খরচ করেছিল। বিশ্বে আমদানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৩০তম। টাকার হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য আমদানি করে চীন থেকে। কিন্তু পণ্যের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় ভারত থেকে। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশ থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানি করে।

কোনো দেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যকে বলে ঐ দেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ হিসেবে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৩.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে দাড়ায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কির ডলার। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি সবচেয়ে বেশি– চীনের সাথে, ২য় স্থানে আছে ভারত।

আমদানির চিত্র

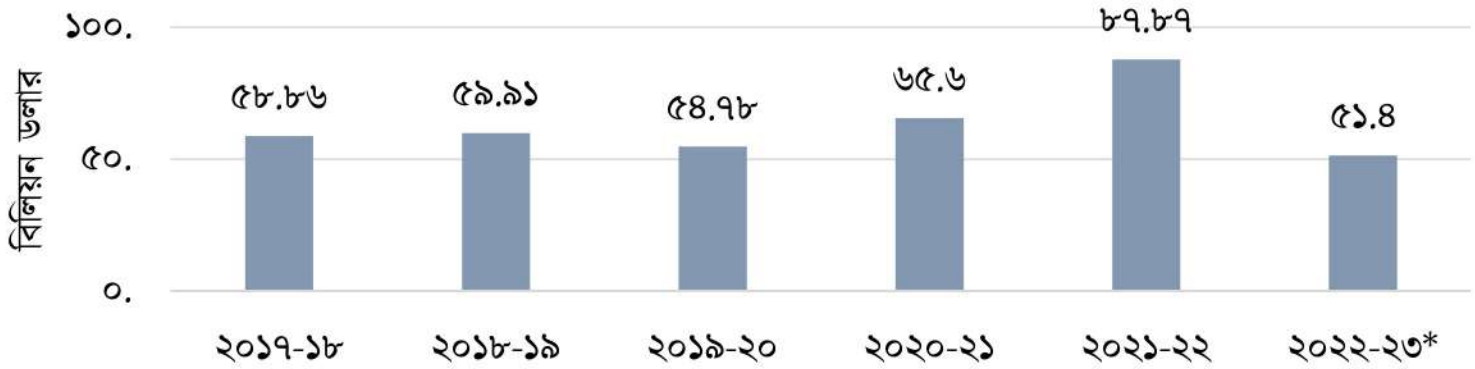

** এপ্রিল – ২০২৩ পর্যন্ত*

[তথ্যসূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২২]

বাংলাদেশের বাণিজ্য

বিভিন্ন পণ্যের আমদানির অবস্থান ও পরিমাণ (২০২০-২১)					
অবস্থান	পণ্যের নাম	পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	অবস্থান	পণ্যের নাম	পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১ম	মূলধনী যন্ত্রপাতি	১০,১৭৪	৪র্থ	কাঁচা তুলা	২,৪৯৮
২য়	পেট্রোলিয়াম সামগ্রী	৪,৭৪৭	৫ম	গম	১,৫৮৩
৩য়	অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২,৫৩৮	৬ষ্ঠ	ভোজ্য তেল	১,৫৪৪

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় (২০২০-২১)		
দেশ	আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন ডলারে)	আমদানি ব্যয়ের %
চীন	১৬.৫৯৪	২৫.৯১%
ভারত	১০.৫১৫	১৬.০৩%
জাপান	২.৫৫২	৩.৮৯%

বাংলাদেশের বাণিজ্য

আমদানির বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশ প্রধানত আমদানি নির্ভর দেশ। মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ নানান ভারী শিল্প আমদানি করে।
- মোট আমদানির বেশির ভাগই চীন ও ভারত নির্ভর।
- বেশির ভাগ আমদানি দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর চেয়ে কম। তাই আমদানি দ্রব্য নিয়ে দর কষাকষির ক্ষমতা কম।
- GDP থেকে আমদানি বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ বেশি।

রপ্তানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুসারে, বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮.৭৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাবদ আয় করেছিল। বিশ্বে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৪২তম। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশে নানা ধরনের পণ্য রপ্তানি করে। এদের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে ১২১টি দেশে। আবার, বাংলাদেশ রপ্তানি করে এমন ১০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে ইউরোপীয়ান দেশই রয়েছে ৯টি।

পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি করে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য। সারাবিশ্বে কাঁচাপাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে। রপ্তানিমুখী শিল্পে করোনার ক্ষতি কাটাতে সরকার সহজ শর্তে প্রায় সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এ ঋণ পরিশোধের সময় ৫ বছর।

বাংলাদেশের বাণিজ্য

রপ্তানির পরিমাণ

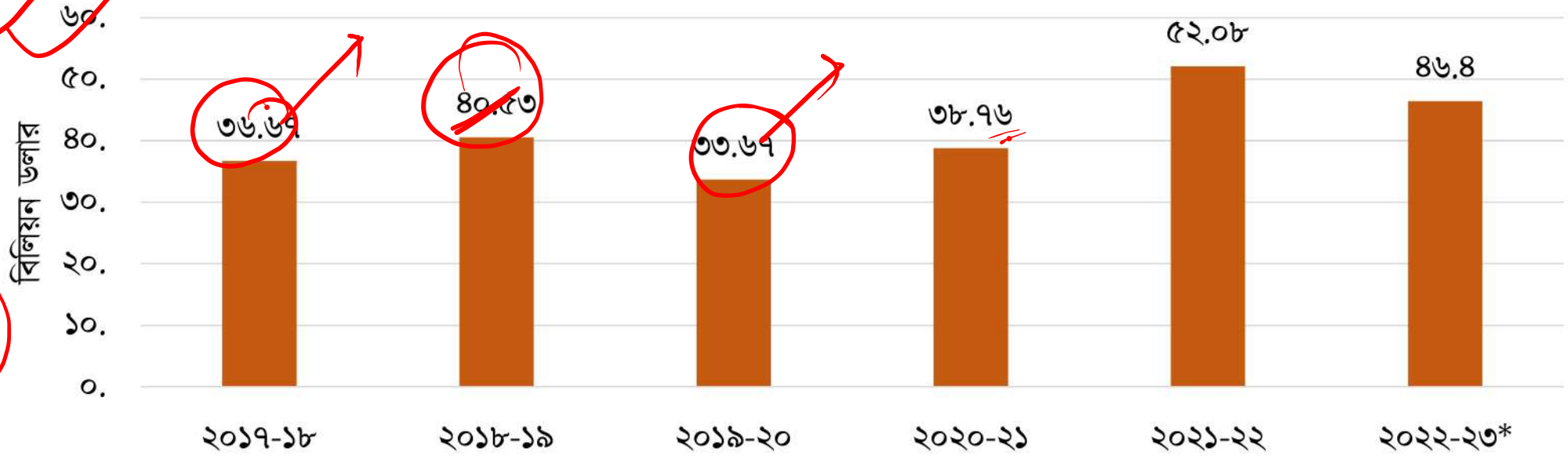

[* মার্চ – ২০২৩ পর্যন্ত]

বাংলাদেশের বাণিজ্য

বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় (২০২০-২১)		
অবস্থান	পণ্যের নাম	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)
১ম	তৈরি পোশাক	৩১,৪৫৬.৭৩
	ওভেন গার্মেন্টস	১৪,৪৯৬.৭০
	নিটওয়্যার	১৬,৯৬০.০৩
২য়	পাট ও পাটজাত পণ্য	১,১৬১.৪৮
৩য়	হোম টেক্সটাইল	১,১৩২.০৩
৪র্থ	কৃষিজাত দ্রব্য	১,০২৮.১৪
৫ম	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৯৪১.৬৭

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় (২০২০-২১)		
দেশ	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	মোট রপ্তানি আয়ের %
যুক্তরাষ্ট্র	৬.৯৭৪	১৭.৯৯%
জার্মানি	৫.৯৫৩	১৫.৩৬%
যুক্তরাজ্য	৩.৭৫১	৯.৬৮%

বাংলাদেশের বাণিজ্য

রপ্তানির বৈশিষ্ট্য

- ✓ রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামালের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। রপ্তানি পণ্যদ্রব্যও সীমিত সংখ্যক: কাঁচা পাট ও মেসতা, পাটজাত-দ্রব্য, চা, কাঁচা চামড়া, মাছ, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি।
- ✓ প্রস্তুতকৃত পণ্য হিসেবে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ইত্যাদি বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট প্রাধান্য পায়।
- ✓ চিংড়ি ও হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য রপ্তানিতে প্রাধান্য পায়।
- ✓ মোট GDP এর অতি সামান্য আয় আসে বৈদেশিক রপ্তানি হতে।
- ✓ রপ্তানি দ্রব্য সামগ্রীর দেশ সীমিত।
- ✓ রপ্তানি পণ্য সংখ্যা স্বল্প।

রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যা

✓ সুষ্ঠু রপ্তানি নীতির অভাব।	✓ সুষ্ঠু বাণিজ্যে চুক্তির অভাব।	✓ মূলধনের স্বল্পতা।
✓ কম সংখ্যক রপ্তানি পণ্য।	✓ নিম্নমানের পণ্য।	✓ অধিক পরিমাণে রপ্তানি শুল্ক ও বাধা আরোপ।
✓ রপ্তানি পণ্যের বাজার সীমিত।		

বাংলাদেশের বাণিজ্য

সুপারিশসমূহ

- ✓ রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করে রপ্তানি পণ্যে বহুমুখীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া।
- ✓ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পুনর্গঠন করা।
- ✓ **শুল্ক রেয়াত:** রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ দানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। এটিই শুল্ক রেয়াত।
- ✓ বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- ✓ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা দেওয়া।
- ✓ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- ✓ ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।

বৈদেশিক সাহায্য

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা। অনেক সময় অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সেই অর্থসংস্থান করা সম্ভব হয় না। তখন নির্ভর করতে হয় বৈদেশিক সাহায্যের উপর। বৈদেশিক সাহায্য বলতে একটি দেশের জরুরি প্রয়োজনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খাদ্য, ঔষুধ, প্রকল্প, দান, অনুদান, ঋণ, আর্থিক ও কারিগরি যেকোনো ধরনের দেশ বর্হিভূত সহায়তা গ্রহণ ও প্রদান উভয়কে বোঝায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যখন কোনো দেশ বৈদেশিক কোনো উৎস হতে ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে তখন তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। এক্ষেত্রে ঋণ সাহায্য গ্রহণ করলে তা শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসমেত ফেরত দিতে হয়। অপরদিকে অনুদান-সাহায্য গ্রহণ করলে তা ফেরত দিতে না হলেও বিভিন্ন কঠিন শর্ত পালন করতে হয়। বাংলাদেশে দৈনন্দিন বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈদেশিক সাহায্য

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের চিত্র

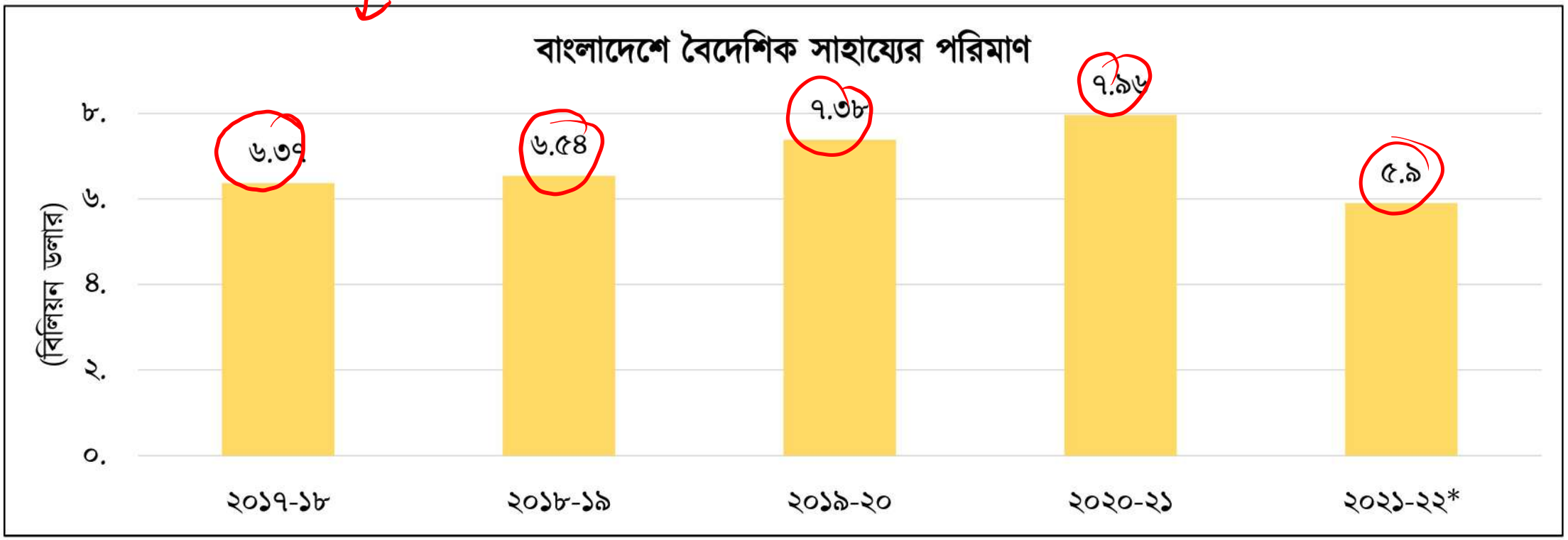

[ফেব্রুয়ারি – ২০২২ পর্যন্ত]*

[তথ্যসূত্র : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়]

বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিবিভাগ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক সাহায্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- **খাদ্য সহায়তা :** খাদ্য সহায়তা বলতে নানান খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে চাল, গমসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণত দাতাদেশ প্রেরণ করে থাকে।

- **প্রকল্প সহায়তা :** দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যে সাহায্য গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তাকে প্রকল্প সহায়তা বলে। এক্ষেত্রে আর্থিক, কারিগরি সাহায্যের পাশাপাশি তথ্য সেবা ও তথ্য সাহায্য প্রদান করতে পারে। যেমন: বঙ্গবন্ধু সেতু প্রকল্প।

- **অপ্রকল্প সহায়তা:** অপ্রকল্প সহায়তা বলতে নানা ধরনের পণ্যসামগ্রীর সাহায্যকে বোঝায়। যেমন: ভোজ্য তেল, দুধ, ওষুধপত্র, সার ইত্যাদি।

এছাড়াও রয়েছে –

- সামরিক সাহায্য
- প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)

বৈদেশিক সাহায্য

আবার আর্থিক বিবেচনায় বৈদেশিক সাহায্য তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

১. দান	২. অনুদান	৩. ঋণ
দান করা অর্থ ফেরত দিতে হয় না এবং গ্রহীতা দেশকে দানের অর্থ ব্যয়ের খাত উৎস বা দাতা দেশ নির্ধারণ করে দেয় না।	অনুদান কোনো বিশেষ খাতে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রদান করা হয় এবং তা ফেরত দিতে হয় না।	ঋণ কোনো বিশেষ কর্ম বা প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করা হয়। ঋণের সুদ ও আসল দুটিই নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিতে হয়।

বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের উৎস

বাংলাদেশের জন্য প্রধান প্রধান বৈদেশিক সাহায্যের উৎস হলো জাপান, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইইসি, জাতিসংঘ, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, ওআইসি, ওপেক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশ আরও অনেক বন্ধু দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ উল্লিখিত দেশ বা সংস্থাগুলো থেকে প্রায় ৭৩৮১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৯৫৯.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে সাহায্যের পরিমাণ হয় ৫৮৯৯.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একক সংস্থা হিসেবে গত অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য আসে IDA (International Development Association) ও দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি সাহায্য আসে জাপান হতে।

[উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২২]

বৈদেশিক বিনিয়োগ

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment, FDI)

FDI হলো একটি দেশে অবস্থিত একটি কোম্পানি দ্বারা অন্য দেশে অবস্থিত একটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ। সহজ ভাষায় এফডিআই হলো এক ধরনের বিনিয়োগ যেখানে একটি ফার্ম, কোম্পানি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের অর্থ বিদেশে বিনিয়োগ করে বা অন্য দেশে একটি ব্যবসায়িক সত্তার মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে। বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ সাধারণত এমন দেশগুলোতে করা হয় যেখানে মুক্ত অর্থনীতি, উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা হারে দক্ষ শ্রমিক রয়েছে।

Financial Times এর মতে, "কোনো একটি দেশের কোম্পানির অপরাপর রাষ্ট্রে মূলধন হস্তান্তর করে বাণিজ্য প্রসারিত বা নিয়ন্ত্রণ করাকে সরাসরি/প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বলা হয়।"

FDI দুইভাবে হতে পারে। যথা:

- ✓ অপরাপর দেশে কোম্পানি ক্রয় করে সেটায় মূলধন স্থানান্তর। যাকে Green Field Investment বলে।
- ✓ নিজ দেশের কোম্পানির আকার বড় করে অপরাপর দেশে শাখা করা। একে Merger and Acquisition (M&A) বলে।

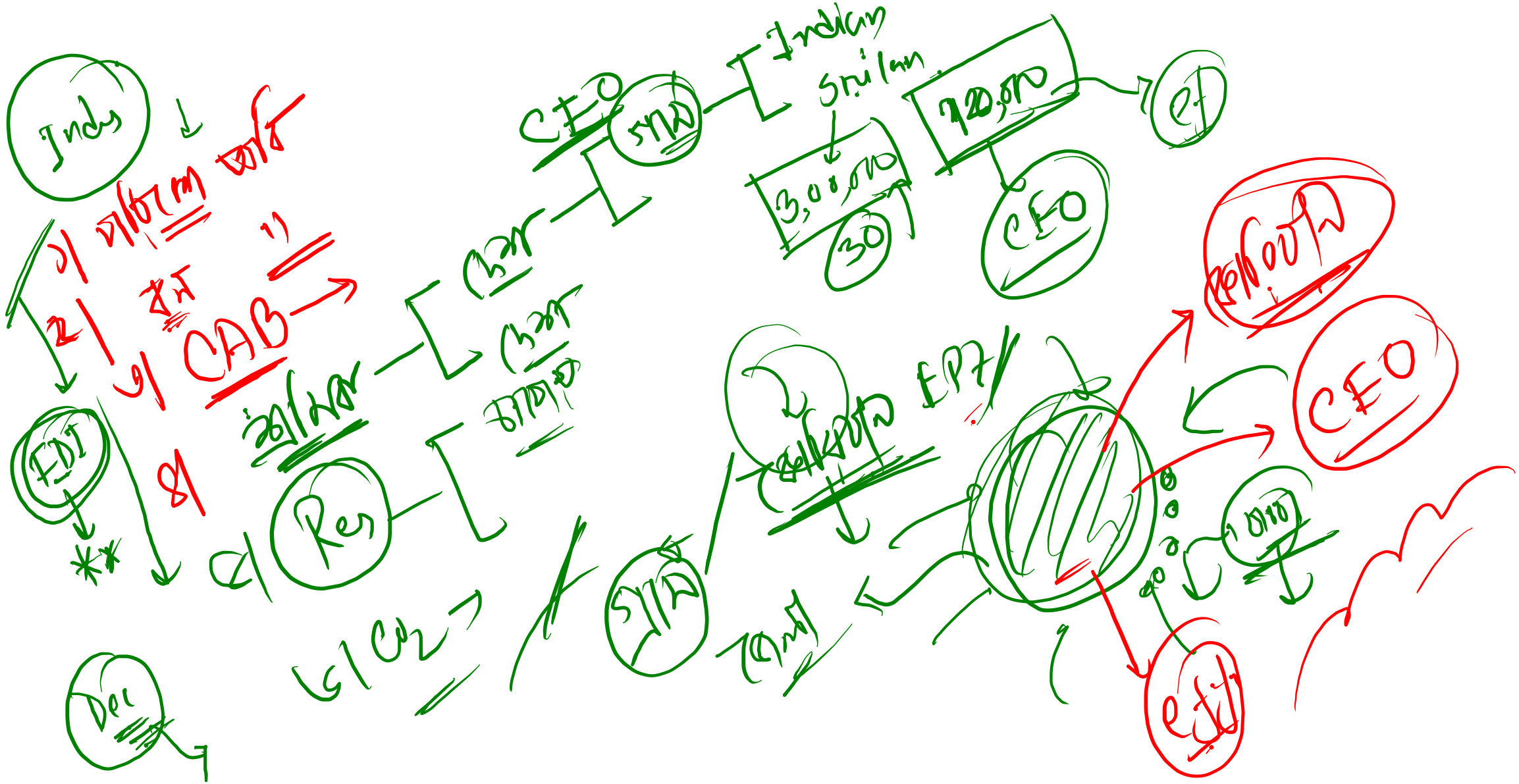

Indy
CEO
Indian
Sri lan
3,00,000
30
CAB
EDI
Res
Dec
EPZ
CEO
CEO
e.f

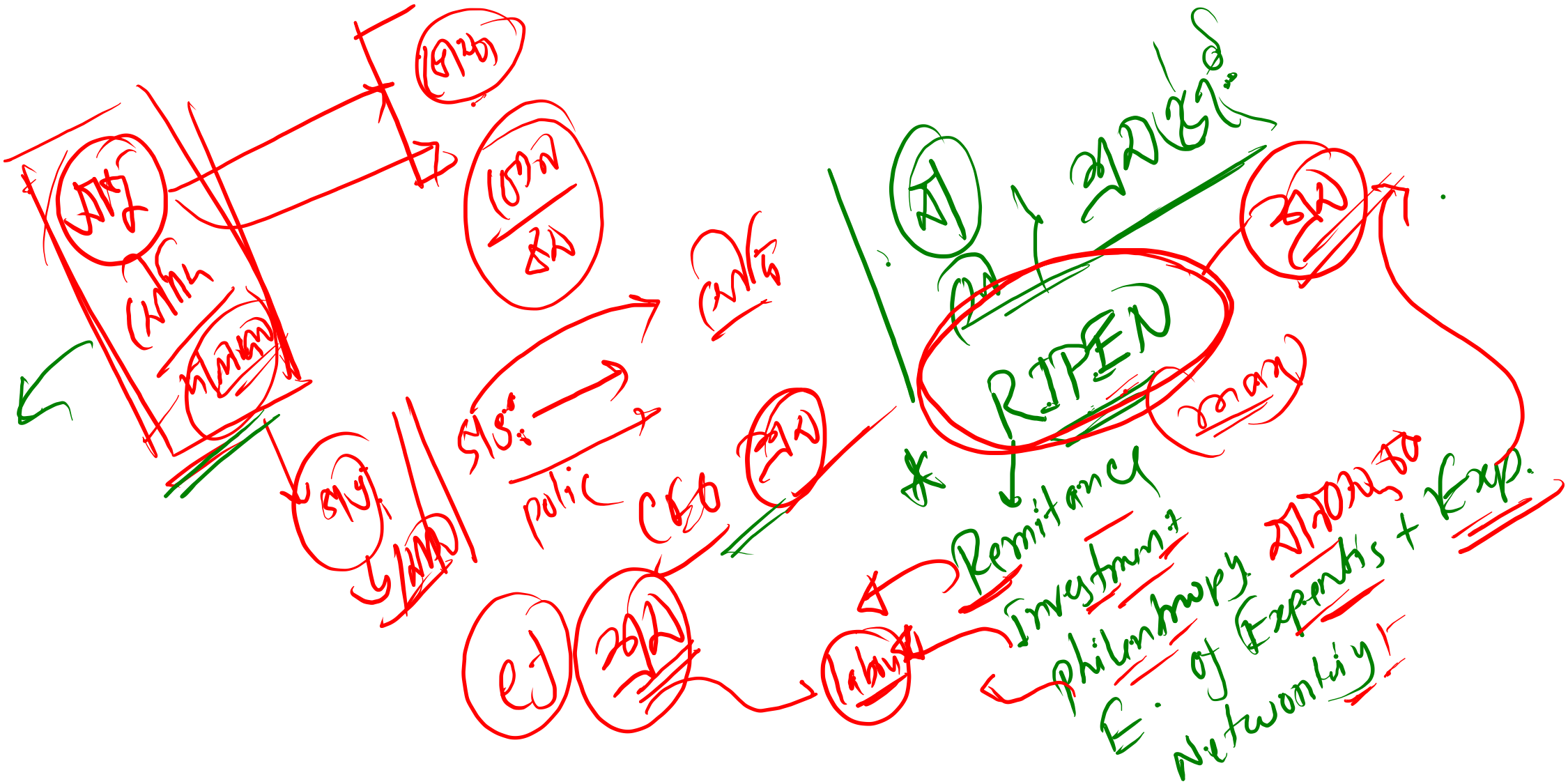
RIPEN
Remittance
Investment
philanthropy
E. of Experts + Exp.
Networking

বৈদেশিক বিনিয়োগ

FDI এ নিয়োজিত কোম্পানিগুলোকে বলা হয়-

✓ বহুজাতিক কোম্পানি (MNCs)	✓ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান (MNIs)	✓ আন্তঃদেশীয় কর্পোরেশন (TNCs)

কোনো বিদেশি রাষ্ট্র FDI এ আগ্রহী হবে যদি নিশ্চিত হয় যে,

- ✓ তার বিনিয়োগকৃত মূলধন নিরাপদে থাকবে।
- ✓ ব্যাংক থেকে মূলধন প্রাপ্তির সহজলভ্যতা।
- ✓ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, শ্রমিক, কাঁচামালের ও অন্যান্য উপকরণের সহজলভ্যতা।
- ✓ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- ✓ আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক জটিলতা কম।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

FDI এর সুবিধাসমূহ

✓ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং কর রাজস্ব বৃদ্ধি করে। ✓ বিনিয়োগকারী সংস্থাকে একটি দেশের বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। ✓ বিনিয়োগকারী কোম্পানি একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- ধাতু, জীবাশ্ম ও জ্বালানি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে।	✓ এর মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ✓ দেশে প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ হয়। ✓ দেশে নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা নিয়ে আসে। ✓ উন্নয়নশীল দেশগুলো নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ

বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণের জন্য নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর প্রভাব স্বরূপ অনেক দেশ বাংলাদেশকে Emerging tiger বা 'উদীয়মান বাঘ' বলে থাকে। World Bank ও IFC কর্তৃক প্রকাশিত Ease of Doing Business: Global Rank- এ ২০২২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম, যা ২০১৯-এ ছিল ১৭৬তম। এছাড়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৯তম। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান Goldman Sachs বাংলাদেশকে "Next-11" বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই বর্তমানে বাংলাদেশ বিনিয়োগের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে চীন ও সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয় বিদ্যুৎ খাতে। ২০২২ সালের World Investment Report অনুসারে FDI আকর্ষণে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

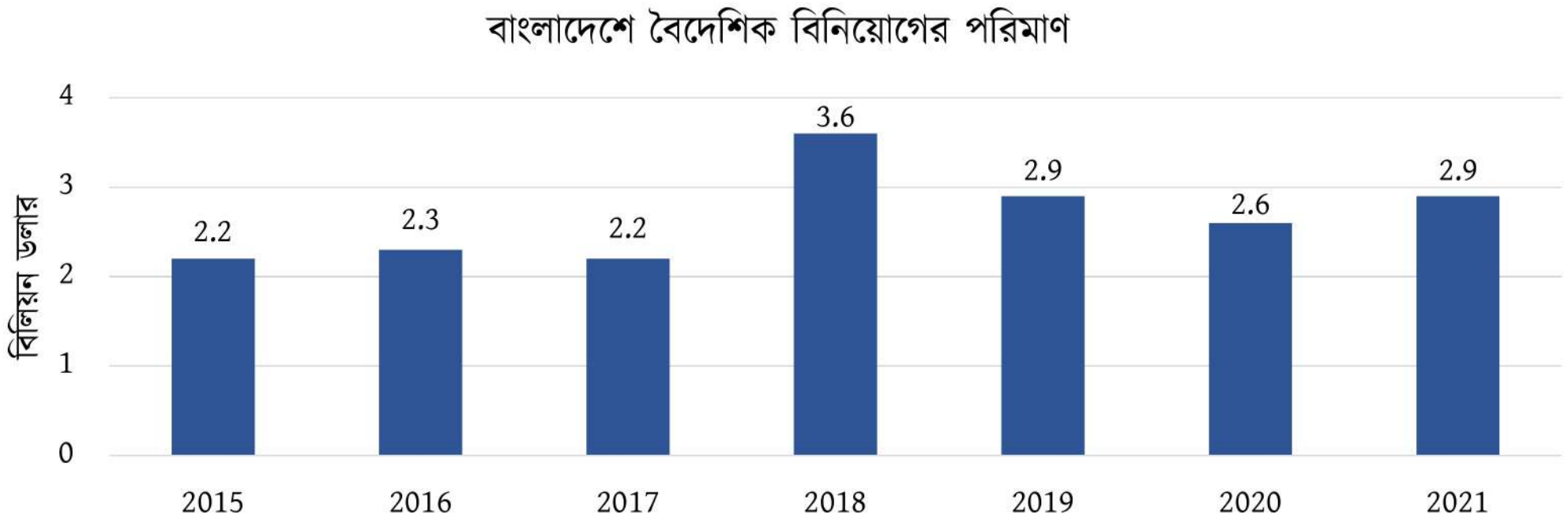

[তথ্যসূত্র : World Investment Report – 2022]

সবচেয়ে বেশি FDI করে	যে খাতে সবচেয়ে বেশি
১. নেদারল্যান্ডস ২. USA ৩. চীন	১. বিদ্যুৎ ২. বস্ত্র

বৈদেশিক বিনিয়োগ

সমস্যা

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও ২০১৮ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৩.৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ পায় বাংলাদেশ। কিন্তু করোনা মহামারির প্রভাবে এ বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ:

✓ যথাযথ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন হয়নি। ✓ বিনিয়োগে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা নানান বিধি-নিষেধের জালে আটকা থাকতে হয়। ✓ যথাযথ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়নি। ✓ বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের নেতিবাচক ইমেজ।	✓ পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব রয়েছে। ✓ প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা। ✓ প্রচারের অভাব।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

FDI/বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকারের পদক্ষেপ

- **BIDA গঠন ও পরিচালনা :** ২০১৬ সালে সরকার বিডা গঠন করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিডা দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় ২৫০০০ উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

- **One Stop Service প্রদান :** One Stop Service এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আইন পাশ হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা প্রদান শুরু করে বিডা। যার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৫৪টি সেবা পর্যায়ক্রমে বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিডা এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- **Ease of Doing Business উন্নতি :** World Bank কর্তৃক প্রকাশিত Ease of Doing Business -এ বাংলাদেশ প্রতিবছরই উন্নতি করছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

- **BEPZA ও BEZA-র মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন :** সরকার বেপজার মাধ্যমে ইপিজেডসমূহের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং বেজা-এর মাধ্যমে SEZ (Special Economic Zone) গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে।
- **বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অবাধ সরবরাহ :** ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা দিতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গ্যাস আমদানির উপর মনোযোগ দিয়েছে।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নত অবকাঠামো তৈরি :** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার মেগাপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও আইটি পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করছে।
- **SEZ গঠন:** সরকার সারাদেশে ১০০টি SEZ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার মধ্যে ৯৩টি অনুমোদন পেয়েছে। ইতোমধ্যে ২৮টিরও বেশি কাজ চলমান আছে।
- **ট্যাক্স হলিডে :** সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে SEZ সমূহে ১০ বছর মেয়াদী ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করেছেন।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর মাধ্যমে ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিডা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। বিডা'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম

শিল্প করিডোর

- ✓ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে শিল্প করিডোর স্থাপনের লক্ষ্যে কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা (Strategic Action Plan) তৈরি করেছে বিডা। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে শিল্প করিডোর স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করা হবে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

✓ উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প-

অনলাইন ওয়ানস্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সেবা প্রদান

One Stop Service এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আইন পাশ হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনলাইন ওয়ানস্টপ সার্ভিস (ওএসএস) সেবা প্রদান শুরু করে বিডা। যার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের ১৫৪টি সেবা পর্যায়ক্রমে বিডার ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিডা এবং ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে-

- ➢ একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বড় ধরনের সেবা দেয়া যাবে।
- ➢ বয়লার সার্টিফিকেটসহ ২৭ ক্যাটাগড়িতে ১২৪টি সেবা এক জায়গায় পাওয়া যাবে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

➢ বর্তমানে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বিডাসহ মোট ৭টি প্রতিষ্ঠানের ২১টি সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

• ভিসা সুপারিশপত্র।	• বিনিয়োগ ছাড়পত্র।	• আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন।
• Work Permit Insurance	• প্রকল্প রেজিস্ট্রেশন ও অনুমোদন ইত্যাদি।	

শ্রম কূটনীতিতে বাংলাদেশ

দেশের জনশক্তি রপ্তানির সবচেয়ে বড় উৎস দেশগুলোর অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের। গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যের জনশক্তি বাজারে শ্রম রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে থাকা দেশগুলোর অধিকাংশই জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরশীল। করোনায় দেশগুলোয় আক্রান্তের সংখ্যা কম হলেও জ্বালানি তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনীতি আবার সংকুচিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা জনশক্তি আমদানি কমানোর পাশাপাশি অনেক প্রবাসী শ্রমিক ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। প্রায় ৪০ লাখ বাংলাদেশির বাস মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্য ৭০-৭৫ শতাংশ বৈধ। কিন্তু করোনার কারণে অনেকে এখন কর্মহীন। বেকার জীবনে তারা অর্থ আর খাদ্যকষ্টে পড়ে গেছেন। অনেককে কোম্পানির কর্তারা ডেকে নিয়ে বাধ্যতামূলক ছুটিতে দেশে পাঠাতে চাইছে। সৌদি আরব থেকেই ১০ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির বিতাড়িত হওয়ার শঙ্কা। শুধু সৌদি আরব নয়, কাতার, ইরাক, বাহরাইনসহ উপসাগরীয় দেশগুলো অবৈধ শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে। এরই মধ্যে কয়েকটি দেশ থেকে অবৈধ হয়ে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় হিমশিম খাওয়া বাংলাদেশের পক্ষে এ মুহূর্তে এমন বার্তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। এটি আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মনে করছেন বৈদেশিক শ্রমবাজার বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে সরকারের দ্বিপক্ষীয় তৎপরতা বাড়ানো উচিত। পাশাপাশি এসব বিষয় তুলে ধরতে হবে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোয়।

শ্রম কূটনীতিতে বাংলাদেশ

- রেমিট্যান্স আয়ের বৃহৎ ক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানিকে বিপন্ন করে তুলেছে কভিড-১৯। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় বর্তমানে অন্তত ৪০ লাখ বাংলাদেশি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। অভ্যন্তরীণ চলাচল সীমিত করে দেয়ার কারণে ব্যাঘাত ঘটছে তাদের পেশাগত জীবনযাত্রায়ও। অচিরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে দেশের রেমিট্যান্স আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

- করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যাপক হারে প্রবাসীরা আতঙ্কে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ভিসা জটিলতাসহ নানা কারণে প্রতিদিন ফেরত আসছেন প্রবাসীরা। তারা চাকরি ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় রয়েছেন। এতে ওইসব দেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক ধারা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরব থেকে। এ দেশটিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে। এখানেও করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফলে এসব দেশে কর্মরত অনেক প্রবাসীই যেমন বাংলাদেশে চলে আসছেন, তেমনি দেশ থেকে নতুন করে ওইসব দেশে কোনো কর্মী যাচ্ছেন না।

- এ অবস্থা চলতে থাকলে রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। দেশের অর্থনীতির একমাত্র রেমিট্যান্স ছাড়া সব সূচকই নিম্নমুখী। এখন করোনার প্রভাবে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির হারও হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। তাই রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে নতুন শ্রমবাজারের দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি যেসব দেশে বাংলাদেশি শ্রমিক কর্মরত, তাদের দেখভালের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে সরকারকে। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসাসহ সামগ্রিক সুরক্ষায় সব ধরনের সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানবিক বিবেচনায় কয়েকটি দেশ থেকে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

শ্রম কূটনীতিতে বাংলাদেশ

- প্রবাসী শ্রমিকদের রক্ষায় সরকারকে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা এবং সেখানে বৈধভাবে বসবাসকারীদের ফেরত না পাঠানোর জন্য লবিং জোরদার প্রয়োজন। যেসব বাংলাদেশি প্রবাসীর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা ইকামার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের ভিসা/ইকামার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো কর্মী বিদেশে চাকরিচ্যুত হলে অথবা নিয়োগকারী কোম্পানি যদি কর্মী ছাঁটাই করে, সেক্ষেত্রে তাদের দেশে না পাঠিয়ে সে দেশের অন্য কোনো কোম্পানিতে নিয়োগে লবিং করা যেতে পারে। একই সঙ্গে ফেরত আসাদের কীভাবে সহায়তা দেয়া হবে, তারও একটি পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক।

- মিসরও তাদের বিপুল শ্রমিক বিশেষত যাদের ওয়ার্ক পারমিট শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাদের ফেরত নিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ এখন অবৈধ ও অনেক বৈধ শ্রমিককে ফেরত পাঠাতে তৎপর। এ অবস্থায় বৈধদের সংশ্লিষ্ট দেশে রাখতে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি যাদের কাজের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, সেগুলো নবায়ন করার উদ্যোগও নিতে হবে। অবৈধ এবং যাদের প্রবাসে আর থাকার সুযোগ নেই,তাদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করতে হবে। এজন্য প্রথমেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে ফেরত আসাদের স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজনের লক্ষ্যে স্বল্প সুদে বা বিনা সুদে ঋণ দিতে পারে। ফেরত আসাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের কাজে দক্ষতা অর্জন করে থাকবে। আমাদের প্রকল্পগুলোয় তাদের ব্যবহারের সুযোগ কিন্তু রয়েছে।

অর্থনৈতিক কূটনীতি

অর্থনৈতিক কূটনীতি হলো কূটনীতির এমন একটি রূপ যা একটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অর্থনৈতিক সরঞ্জামগুলোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করাকে বুঝায়। অর্থনৈতিক কূটনীতির পরিধি একটি রাষ্ট্রের কেবল নীতিগত সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সকল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন, আমদানি-রপ্তানি, বিনিয়োগ, শ্রমশক্তি রপ্তানি, বৈদেশিক সাহায্য, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদির মধ্যে বিস্তৃত। Financial Express- এর মতে,
"Economic Diplomacy is the process through which Countries tackle the outside world to maximize their national gain in all the fields of activity, including Trade, Investment and other terms of Economically beneficial exchanges, where they enjoy comparative advantage."

সংক্ষেপে অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ এবং বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য নানান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানোকে বুঝানো হয়। অর্থনৈতিক কূটনীতি তিনটি স্তরে কাজ করে। যথা: ১. দ্বিপক্ষীয় ২. আঞ্চলিক ৩. বহুপাক্ষিক। এর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক কূটনীতি বেশি কার্যকর। যাতে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, বিনিয়োগ চুক্তি, কর্মসংস্থান বা অতিরিক্ত কর/শুল্ক পরিহার, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান।
অর্থনৈতিক কূটনীতিকরা সাধারণত বিদেশের অর্থনৈতিক নীতিগুলো পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন করা, বিনিয়োগ সম্ভাবনা এবং কীভাবে তাদের দেশের সর্বোচ্চ উপকার হবে তা নির্ধারণ ও সুপারিশ করে। বর্তমানে সাধারণ কূটনীতিকরাও এ কাজ করে থাকে।

অর্থনৈতিক কূটনীতি

উদ্দেশ্য: অর্থনৈতিক কূটনীতির উদ্দেশ্য মূলত ৩টি। যথা:

- ✓ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা,
- ✓ রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ,
- ✓ শ্রমশক্তি বিদেশে রপ্তানিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপাদান: এর উপাদান প্রধানত ৩টি। যথা:

- ✓ বাণিজ্যিক কূটনীতি: বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পর্কের ব্যবহার।
- ✓ নীতি প্রণয়ন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি: দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পাদনে নানান নীতি ও চুক্তি স্বাক্ষর।
- ✓ আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ: আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশকে একীভূত করে স্বার্থ হাসিল করা।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

একটি উন্নয়নশীল ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক, IMF, WTO, ADB ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। এ সকল সংস্থাগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও মানবসেবামূলক কর্মসূচিতে সহজ শর্তে ঋণ ও নানা অনুদান প্রদান করে।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা সংস্থা যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করে। বিশ্বব্যাংকের আনুষ্ঠানিক লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন। সারা বিশ্বের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর প্রধান সদর দপ্তর ওয়াশিংটন, ডি.সি.-তে অবস্থিত। সংগঠনটির আর্টিকেলস্ অব এগ্রিমেন্ট (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ সালে এ সংশোধনীটি কার্যকর হয়) অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করা এবং পুঁজির বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, এ দু'টি উদ্দেশ্য হবে বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক। দুইটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশ্বব্যাংক গঠিত: পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) আর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association, IDA)। বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাংক গ্রুপের মোট চারটি সদস্যের মধ্যে একটি। অন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান হলো আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (International Finance Corporation, IFC), মিগা (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) ও আইসিএসআইডি (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে যৌথভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য হয়। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সহযোগী হয়ে কাজ করে থাকে। বিশ্বব্যাংক অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক লোকজন এবং স্থানীয় স্টকহোল্ডারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রজেক্টে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

মাঝে পদ্মা সেতুকে ঘিরে মতান্তর দেখা গেলেও সংস্থাটির অর্থায়ন কার্যক্রমে তার প্রভাব তেমন একটা পড়েনি। বরং গত এক দশকে দুই পক্ষের আর্থিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি আরো বেড়েছে। ২০১১ সালেও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের মোট অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি ছিল প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার। পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন থেকে সরে আসার পর প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ কমে যায়। যদিও ২০১৪ সালেই তা ৬ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে। ২০১৯ সালে সংস্থাটির প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। আর ২০২০ সালে অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি দাঁড়ায় ২১ বিলিয়ন ডলার। আবার একই সঙ্গে অর্থছাড়ও বেড়েছে। ২০১৯ সাল শেষে যার পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

গত অর্থবছরেও (২০২১-২২) তৃতীয় সর্বোচ্চ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের জন্য প্রায় ১৬৭ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা ছাড় করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০২২ পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশের জন্য বেশ কয়েকটি ঋণ অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের বোর্ড। ২০২২ সালের মার্চে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা পৌনে দুই কোটি গরিব কৃষকের আয় বাড়াতে ১২ কোটি ডলার ঋণ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি। আঞ্চলিক কানেক্টিভিটিতে বিনিয়োগের জন্য গত জুনের শেষদিকে বাংলাদেশের জন্য ৭৫ কোটি ডলারের একটি ঋণ অনুমোদন করেছে বিশ্বব্যাংক।

করোনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার পাশাপাশি দুর্যোগ ও রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলাসহ ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবেলায় আরো ৩০ কোটি ডলারের ঋণ দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিষয়টি নিয়ে আগস্ট, ২০২২ এ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের একটি চুক্তি হয়েছে। আগামী তিন অর্থবছরে বাজেট সহায়তা হিসেবে সংস্থাটির কাছে আরো ৭০ কোটি ডলার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে সরকারও এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে বিশ্বব্যাংকের কাছে ১০০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা চেয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যংক তাদের সম্পর্কের সেরা সময় পার করছে।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

IMF ও বাংলাদেশ

International Monetary Fund (IMF) বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা এর প্রধান কাজ। এই সংস্থা ১৯৪৪ গঠিত হলেও কার্যক্রম শুরু হয় ১ মার্চ ১৯৪৭ সালে। প্রতিষ্ঠাকালীন ২৯টি দেশ চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, ডি.সি. শহরে অবস্থিত। এখন পর্যন্ত ১৯০টি রাষ্ট্র এই সংস্থার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

সাধারণত যখন কোনো দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টে বড় রকমের ঘাটতি তৈরি হয় তখন তারা IMF এর দ্বারস্থ হয়। অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন কোনো দেশ ঘাটতিতে পড়ে, যখন বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষত ডলারের ঘাটতি তৈরি হয় তখন IMF ঋণ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ এর আগে IMF'র কাছে ঋণ চেয়েছিল ১০ বার। প্রথমবার ঋণ নিয়েছিল ১৯৭৪ সালে। IMF এর ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঋণের জন্য সংস্থাটির কাছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি গিয়েছে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯০ সালে। এই ১০ বছরে বাংলাদেশ IMF এর কাছ থেকে পাঁচ বার অর্থ ধার করেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে অর্থনৈতিক অবস্থা যেহেতু ভালো ছিল না সেজন্য বিভিন্ন সময় ঋণ চাইতে হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় দেশটিতে সামরিক শাসন থাকায় তেমন কোনো অর্থনৈতিক সংস্কারও হয়নি। ফলে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই IMF এর দ্বারস্থ হয়েছে বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

IMF যখনই বাংলাদেশকে কোনো ঋণ দিয়েছে তখনই তারা কিছু শর্ত বা পরামর্শ দিয়েছে। এসব শর্তের কিছু বাংলাদেশে মেনে নিয়েছে আবার কিছু মেনে নেয়নি। ঋণের ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালে IMF এর বেশ কয়েকটি শর্ত ছিল। সেসব শর্তের আলোকে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়। এছাড়া বাণিজ্য উদারীকরণ, ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের শর্তও এসেছিল। এসব প্রক্রিয়ার সাথে বিশ্বব্যাংকও জড়িত ছিল।

১৯৯১ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ IMF এর কাছ থেকে কোনো ঋণ নেয়নি। এরপর বাংলাদেশ আবার IMF'র কাছে থেকে ঋণ নেয় ২০০৩ সালে। সেবার বড় শর্ত ছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান কমিয়ে আনতে হবে। তখন IMF এর শর্ত মেনে আদমজী পাটকল বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার। ২০১২ সালে যার পরিমাণ ছিল প্রায় এক বিলিয়ন ডলার। সে সময় ট্যাক্স পলিসির ক্ষেত্রে কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল। সে সময় নতুন ভ্যাট আইন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া মুদ্রার বিনিময় হার এবং সুদের হার নির্দিষ্ট করে তা কৃত্রিমভাবে ধরে না রেখে বাজারের উপর ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল IMF।

সর্বশেষ ২০২২ সালে ডলার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে IMF এর কাছে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ঋণ চেয়েছিল বাংলাদেশ, যার অংক সাড়ে চারশো কোটি ডলার। গণমাধ্যমে খবর এসেছে যে IMF বাংলাদেশকে শর্ত দিয়েছে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি তুলে নেবার জন্য। এজন্য সরকার এক লাফে জ্বালানি তেলের দাম ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছিল বলে অনেকে ধারণা করেছেন। পরবর্তীতে IMF ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে যা সাতটি কিস্তিতে পাওয়া যাবে। প্রথম কিস্তি পায় ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের অর্জন

অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বর্তমানে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করছে। বাংলাদেশ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সুসম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। নিম্নে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো-

- **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** ২০১৬ সালে বাংলাদেশে FDI এর পরিমাণ ছিল ২.৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ৩.৬ বিলিয়ন ডলার হয়। যদিও করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে FDI এর পরিমাণ হ্রাস পায়, তথাপি বর্তমানে FDI এর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থবছর	পরিমাণ	সবচেয়ে বেশি যে দেশ FDI করে	যে খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ
২০১৯	২.৯ বিলিয়ন ডলার	নেদারল্যান্ড	বিদ্যুৎ
২০২০	২.৬ বিলিয়ন ডলার	যুক্তরাষ্ট্র	বস্ত্র
২০২১	২.৯ বিলিয়ন ডলার	চীন	

[তথ্যসূত্র: World Investment Report – 2022]

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

➢ **বাণিজ্য বৃদ্ধি :** বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন অর্থবছরে বাণিজ্যের পরিমাণ দেখানো হলো।

অর্থবছর	রপ্তানি
২০১৬-১৭	৩৪.৮৫ বিলিয়ন ডলার
২০১৭-১৮	৩৬.৬৬ বিলিয়ন ডলার
২০১৮-১৯	৪০.৫৩ বিলিয়ন ডলার
২০১৯-২০	৩৩.৬৭ বিলিয়ন ডলার
২০২০-২১	৩৮.৭৫ বিলিয়ন ডলার
২০২১-২২	৫২.০৮ বিলিয়ন ডলার

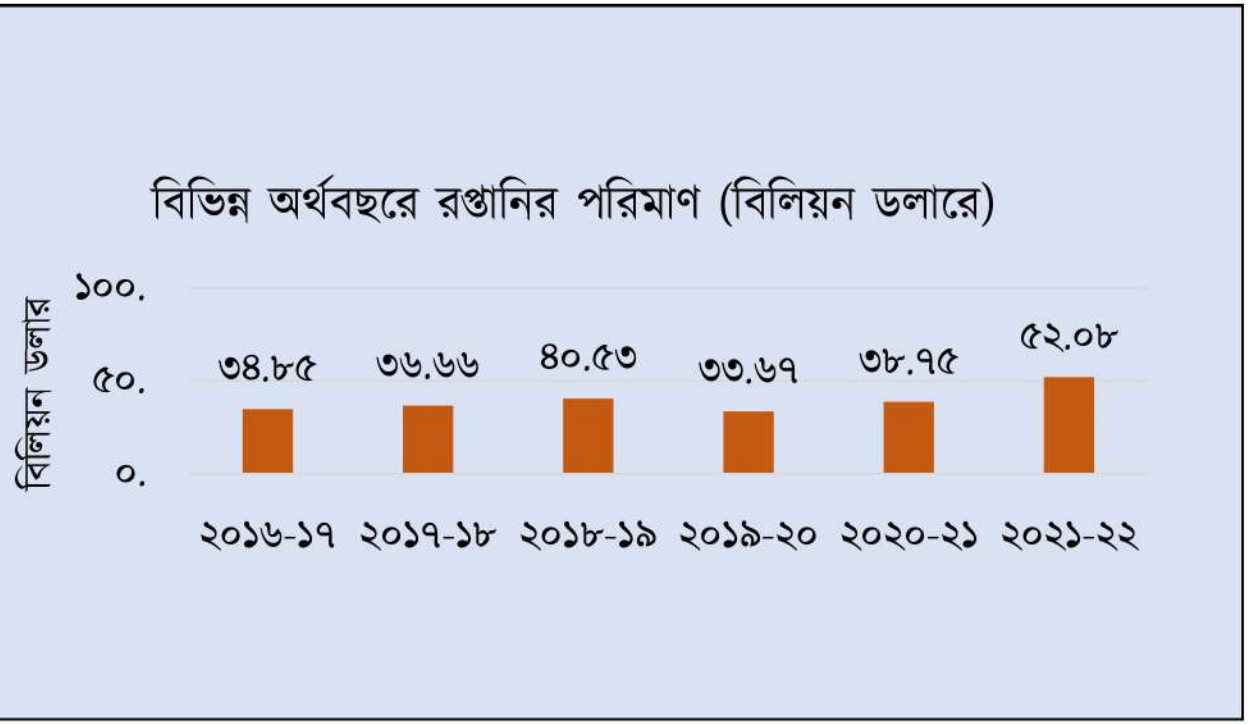

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক]

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

- **বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি:** বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি লাভ করছে। ঠিক তেমনি বাণিজ্যের বিভিন্ন সূচকেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন : পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ম, এছাড়াও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ৩য়, বাইসাইকেল রপ্তানিতে ৭ম এবং প্রবাসী আয় অর্জনে বিশ্বে ৭ম।
- **রিজার্ভ বৃদ্ধি:** করোনা মহামারিকালে বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ রিজার্ভ অর্জন করে। তখন সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ মজুদ হয়।
- **বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাবে ক্রয়াদেশ প্রাপ্তি:** যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে চীন হতে নানান কারখানা স্থানান্তর হয় যে সুবিধা কিছুটা বাংলাদেশ পায়। এর ফলে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পায়।
- **টিকা ক্রয়ে ব্যবহার:** বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে বিভিন্ন দেশ যথা: চীন, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত হতে টিকা ক্রয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতির যথাযথ ব্যবহার করে টিকার যোগান নিশ্চিতকল্পে সফলতা দেখাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

সরকারের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদক্ষেপসমূহ

- **বিনিয়োগ আকর্ষণ:** সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে BIDA গঠন ও পরিচালনা করছে। One Stop Service এর মাধ্যমে সেবা প্রদান, BEPZA ও BEZA এর মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, SEZ গঠন ও Ease of Doing Business এর উন্নতির মাধ্যমে এসব বিষয় আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে তোলা হচ্ছে।

- **বৈদেশিক কর্মসংস্থান :** সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও প্রবাসীদের বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এছাড়াও বর্তমানে জাপানে ৩.৫ লাখ কর্মী প্রেরণসহ নতুন নতুন প্রায় ৬৩টি শ্রম বাজার সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। G2G পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ইত্যাদি ও প্রবাসীদের টিকা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সুবিধা তুলে ধরে আলাপ-আলোচনা করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

- **রপ্তানি বৃদ্ধিতে :** সরকার রপ্তানি বৃদ্ধিকরণে পোশাক রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার উন্মোচন করেছে। যার ফলশ্রুতিতে অপ্রচলিত বাজারে ৬.৩৬ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন ধরনের পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ ১০ ধরনের পোশাক বিদেশে রপ্তানি করছে। তাছাড়াও নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য আবিষ্কার, বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং অতি অল্প সময়ে পণ্য রপ্তানি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

- **GSP প্লাস প্রাপ্তি :** যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রাপ্তিতে সরকারকে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে পাশাপাশি ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে জিএসপি প্লাস প্রাপ্তি ও অন্যান্য বাণিজ্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন দেশের জোটের সাথে যেমন PTA, FTA সহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

- **পরিবেশ:** পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং Green Economy এর দিকে ধাবিত হতে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির আওতায় GCF হতে প্রাপ্য অর্থ নিশ্চিতকরণ এবং জলবায়ুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বিশ্ব দরবারে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ

- **টিকা (Vaccine) :** বাংলাদেশ সরকার টিকাকে বৈশ্বিক পণ্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য জোর প্রচারণা চালাচ্ছে এবং সহজলভ্যে টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে Economic Diplomacy এর আওতায় আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করে সবচেয়ে কম খরচে ও স্বল্প সময়ে টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার টিকার Patent Right পাওয়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
- **Transit সুবিধা :** ভারত, নেপাল ও ভুটানকে ট্রানজিট ও বন্দর সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।
- **চিকিৎসা সরঞ্জাম বিক্রয় :** বর্তমান করোনা মহামারির কারণে বিশ্বে চিকিৎসা সরঞ্জাম রপ্তানির একটি বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে সরকার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
- **জাপান ও ADB:** বাংলাদেশ জাপান হতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ADB, World Bank ও IMF হতে বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য কম সুদে ঋণ নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় শক্তির উপাদান

১. **ভৌগোলিক অবস্থা:** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে ভূ-গোলের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কোনো দেশের ভৌগোলিক দিকগুলো তার জাতীয় শক্তিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অধ্যাপক মর্গেনথু যথার্থই বলেছেন যে, "ভূ-গোল সবচেয়ে স্থায়ী উপাদান যার উপর কোনো দেশের জাতীয় শক্তি নির্ভর করে"। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফসল আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র জাতিসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এরূপ অবস্থায় তাদেরকে বিভিন্নভাবে একে অপরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে তাদের পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক এমনকি প্রাকৃতিক ভূ-গোলের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এ-দিক থেকে বিচার করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আমরা গতিশীল ভূ-গোল বলতে পারি।

জাতীয় শক্তির উপাদান

২. **প্রাকৃতিক সম্পদ:** ভৌগোলিক অবস্থানের ন্যায় প্রাকৃতিক সম্পদ হল আর একটি উপাদান, যা কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই কোন দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন যথার্থই বলেছেন যে, "একটা দেশের অর্থনৈতিক জীবন প্রধানত তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল অথবা অভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে"। প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) **খাদ্য ও**

(খ) **কাঁচামাল।**

জাতীয় শক্তির উপাদান

(ক) খাদ্য: খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোনো দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজন। সাধারণত যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে দেশ খাদ্য ঘাটতি দেশের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে। উদাহরণসরূপ, একবার রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক বিশিষ্ট রত্ন কালিদাসকে বুদ্ধির দৌড়ে কিছুতেই পরাজিত করতে না পেরে অন্য একজন সভাসদ এক চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি কালিদাসের স্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, পরদিন রাজসভায় যাবার সময় তিনি যেন কালিদাসকে বলেন যে, "তণ্ডুল নাস্তি অর্থাৎ ঘরে চাউল নেই"। এ-চাতুরী ঐ সভাসদের অভীষ্টলাভে সহায়ক হয়, কারণ স্ত্রী ঐ কথা বলার পর সেদিন রাজসভায় কালিদাসকে সর্বক্ষণ চিন্তায় বিভোর থাকার দরুন সেই সভাসদ তাকে বুদ্ধির মারপ্যাঁচে অতিসহজেই পরাজিত করেন।

(খ) কাঁচামাল: কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজন ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল, যা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনে, বিশেষত যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরিতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক মনে বলেছেন, "কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে কাঁচামালরূপী প্রাকৃতিক সম্পদ কী ধরনের চূড়ান্ত ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বহন করবে, তা অনিবার্যরূপে নির্ভর করে ইতিহাসের বিশেষ কোনো সময়ের যুদ্ধের প্রযুক্তিবিদ্যা কতটুকু উন্নত তার উপর"। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এত বেশি উন্নতি লাভ করেছে যে, শান্তি ও যুদ্ধ উভয় সময়ের জন্যই শিল্পকারখানার উৎপাদনের উপর কোন দেশের শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত গুরুত্বের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কয়লা ও লৌহের ব্যবহারের উপরই কোন দেশের শান্তিকালীন সমৃদ্ধি ও যুদ্ধকালীন ক্ষমতা নির্ভর করত। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, এ-কালের সর্ব বৃহৎ শক্তিগুলাই উক্ত দুটি সম্পদে ধনী ছিল।

জাতীয় শক্তির উপাদান

৩. **শিল্পসামর্থ্য:** যদি কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে জাতীয় উন্নতির জন্য পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে না পারে, তবে সেই দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট শক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আফ্রিকার জায়ার প্রজাতন্ত্র (পূর্বের কঙ্গো) ইউরেনিয়ামের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটা থেকে শক্তি উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞানের অভাবে দেশটি অন্যান্য বৃহৎ শক্তি যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, এমনকি কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। অনুরূপভাবে, ভারতবর্ষ প্রচুর কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর কারণ হল এই যে, উক্ত দুটি দেশ শিল্পে অনগ্রসরতার কারণে তাদের কাঁচামালকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম নয়।

৪. **সামরিক প্রস্তুতি:** একটি জাতির ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পসামর্থ্য প্রভৃতি উপাদান যার মাধ্যমে তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে, তা হল তার উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি। বস্তুত জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারটি এত সুস্পষ্ট যে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। অধ্যাপক লার্চ তাই সত্যাসত্যই বলেছেন যে, "জাতীয় শক্তির অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অলভ্য অভিব্যক্তিই হল সামরিক শক্তি।" অধ্যাপক মর্গেনথুর মতে, "সামরিক প্রস্তুতির জন্য দরকার এমন একটি সামরিক সংগঠন, যা পররাষ্ট্র নীতিকে সহায়তা করতে সক্ষম"। কোন দেশের সামরিক প্রস্তুতি যে-বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে, তা হল: (ক) প্রযুক্তিবিদ্যা

(খ) নেতৃত্ব

(গ) সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা

জাতীয় শক্তির উপাদান

৫. **জনসংখ্যা:** সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, যে দেশ জনবহুল সে দেশই শক্তিশালী। এটা আংশিকভাবে সত্য হলেও আমরা ভুল করব তখনই, যখন আমরা ধরে নেব যে, জনসংখ্যার সাথে শক্তির সম্বন্ধ সবসময়ই স্থির। যে-কোনো দেশের জন্য কাম্য জনসংখ্যাই (optimum population) শ্রেয়। কাম্য জনসংখ্যার অর্থ হল যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশের জন্য জনসংখ্যা বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোন দেশে কাম্য জনসংখ্যা থাকবে, তখন প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তি দেশের শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং জাতীয় শক্তির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। কোনো দেশের জনসংখ্যা কাম্য। জনসংখ্যার অধিক হলে সে-দেশের শক্তি বৃদ্ধি না পেয়ে এটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

৬. **জাতীয় চরিত্র ও মনোবল:** কোনো দেশের জনগণের চরিত্র ও মনোবলের উপরও সে-দেশের শক্তি অনেকটা নির্ভর করে। জাতীয় মনোবল সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ অমুসলিমদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও শুধু ঈমানের জোর তাদের যে মনোবল এনে দেয়, তাই তাদের যুদ্ধ জয়ে অনেক সহায়তা করে। সেই মনোবলের জোরেই একসময় অর্ধ পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিজয়নিশান উড্ডীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বিমানবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও ইংরেজদের জাতীয় মনোবলের দরুণই ইংল্যান্ড অনেকটা অবিচলিত থাকে। অন্যদিকে ফরাসিদের জাতীয় মনোবলের অভাবেই ম্যাজিনো লাইনের (Maginot Line) মতো প্রায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ থাকা সত্ত্বেও তারা হিটলারের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও বাঙালিদের দৃঢ় জাতীয় মনোবল অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমাদের মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মনোবল জনগণের মধ্যে কর্মপ্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়ে যে-কোনো কাজে সাফল্য লাভের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

জাতীয় শক্তির উপাদান

৭. **সরকারের দক্ষতা:** জাতীয় মনোবল জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কোন দেশের জনগণের জাতীয় মনোবল অনেকটা নির্ভর করে তার সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর। যখন জনসাধারণ মনে করে যে, তাদের সরকার তাদেরকে বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে এবং তারা জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তখন স্বভাবতই তাদের জাতীয় মনোবল ভেঙে পড়বে। এরূপ অবস্থায় কোনো বিপদকালীন পরিস্থিতিতে জনগণ তাদের সরকারকে সমর্থন দেবে না, যার ফলে সে-দেশের জাতীয় শক্তি অনেকটা কমে যাবে। সুতরাং দেখা যায় যে কোন দেশের জাতীয় শক্তিতে তার সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. **কূটনৈতিক নৈপুণ্য:** অধ্যাপক মর্গেনথু তার 'Politics Among Nations' পুস্তকে বলেন যে, অস্থিতিশীল হলেও জাতীয় শক্তি গঠনে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে কূটনীতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কূটনৈতিক মান একটি দেশের জাতীয় শক্তিতে নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার মাধ্যমে দেশটিকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারে। অতএব, কূটনৈতিক নৈপুণ্য একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে উচ্চমর্যাদা ও উচ্চস্থান দান করে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা কৌশল

➲ আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র দেশের নিরাপত্তা ধারণায় তাই প্রচলিত সামরিক নিরাপত্তার চেয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়। সার্বিক নিরাপত্তার ধারণা থেকে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়াবলি উপস্থাপন করলে, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার **তিনটি দিক থেকে** বিশ্লেষণ করা যায় :

❖ প্রচলিত নিরাপত্তার ধারণা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা।

১. মায়ানমার দৃষ্টিকোণ

২. সীমান্ত সমস্যা

৩. জল সীমান্ত

৪. পারমাণবিক ভীতি

৫. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

❖ পরিবেশগত নিরাপত্তা

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২. আর্সেনিক সমস্যা

৩. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা

৪. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট

❖ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

১. দারিদ্র্যতার প্রবণতা

২. বিশ্বায়ন প্রভাব

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি কী? আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের নিয়ামকসমূহ আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কী কী? [৩৫তম বিসিএস]
- 'জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নির্ধারক'- ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- অর্থনৈতিক দিক থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরুন। [৩৫তম বিসিএস]
- BCIM দ্বারা কী বুঝায়? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এর প্রধান তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। [৩৩তম, ২৩তম, ১৩তম বিসিএস]
- আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক-এর আওতায় কী কী করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুচনালগ্ন থেকে এ যাবৎ সার্ক-এর অর্জন কতটুকু? [৩০তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতির বিস্তারিত আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বিদেশে আমাদের জনশক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে কী কী ব্যবস্থা নেয়া দরকার? [২৯তম বিসিএস]
- আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' –এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক-এর আওতায় কী কী করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? [২৯তম বিসিএস]
- পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বুঝায়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কী কী ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করেন? বর্ণনা করুন। [২৮তম বিসিএস]
- পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো বর্ণনা দিন। [২৭তম বিসিএস]
- "আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য ।"- আলোচনা করুন। [২৫তম বিসিএস]
- জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা। [২৫তম বিসিএস]
- বৈদেশিক নীতি কী? বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়। তা আলোচনা করুন। [২১তম বিসিএস]
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরুন। [২০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বিদেশি নীতিতে সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো ব্যাখ্যা করুন। [২০তম বিসিএস]
- 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখুন। [১৫তম বিসিএস]
- রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সাফল্য মূল্যায়ন করুন। [১১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [১০তম বিসিএস]

NAM

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

❖ টীকা সমূহ

- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে IMF এর কার্যক্রম [৩৭তম বিসিএস]
- SAARC এবং বাংলাদেশ। [৩৬তম বিসিএস]
- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। [৩৫তম বিসিএস]
- সার্কের সাফল্য [২৭তম বিসিএস]
- SAARC এর ভূমিকা কী? [২৭তম বিসিএস]
- ডি-৮ [২৪তম বিসিএস]
- পঞ্চম সার্ক সম্মেলন [১৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন [১৫তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy